মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : মধ্যবিত্ত জীবন-বাস্তবতা

শাহিনা খাতুন

এম.ফিল. থিসিস

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : মধ্যবিত্ত জীবন-বাস্তবতা

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ সাঈদ-উর রহমান
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
শাহিনা খাতুন
এম.ফিল. থিসিস
রেজিষ্টেশন নং-৩১৭

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নম্বর

ভূমিকা

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যকর্মের পরিচয় ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যবিত্ত শ্রেণি ১০

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে মানিক ও তাঁর বিষয় ভাবনা ২১

চতুর্থ অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন-বাস্তবতা ৩৫

উপসংহার ৯৫

পরিশিষ্ট ৯৭

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম.ফিল গবেষক শাহিনা খাতুন আমার তত্ত্বাবধানে **'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : মধ্যবিত্ত জীবন-বাস্তবতা'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করেছে। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীলাভের জন্য এটি উপস্থাপিত হয়নি, কিংবা এ-সন্দর্ভের অংশবিশেষ অন্য কোথায়ও প্রকাশিত হয়নি। শাহিনা খাতুনকে অভিসন্দর্ভটি জমাদানের জন্য বলা হল।

(ডঃ সাঈদ-উর রহমান)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

ভূমিকা

বাংলা সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রূপগঠনের যুগসন্ধিক্ষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তাঁর জন্ম ১৯ মে ১৯০৮, মৃত্যু ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬। অর্থাৎ মাত্র আটচল্লিশ বছরে আয়ু-সীমায় তাঁর জীবন সীমিত, বাল্য কৈশোর বাদ দিলে তাঁর সাহিত্য-জীবন তেমন কিছু দীর্ঘ নয়। তবুও এসময়ের মধ্যে তিনি ৩৯টি উপন্যাস, ১টি নাটক এবং ১৬টি গল্পগ্রন্থ লিখে গেছেন। এছাড়া একাধিক সংকলন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রকায় তাঁর প্রায় দুই শতাধিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ 'লেখকের কথা' এবং ছোটদের জন্য দুটি সংকলন। প্রথম জীবনে তিনি কবিতাও লিখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর বহুদিন পর ১৯৭০-এ তাঁর একটি সংকলন 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি অনেকের সহায়তা পেয়েছি। আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ডঃ সাঈদ উর রহমানের প্রতি। তাঁর তত্ত্বাবধানে আমি 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : মধ্যবিত্ত জীবন-বাস্তবতা' শীর্ষক গবেষণা শুরু করি। এ কাজে তিনি অনেক মূল্যবান সময় দিয়ে আমাকে গবেষণা কাজে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে আমার গবেষণা কর্ম সংশোধনে সহায়তা করেছেন। এছাড়া এই গবেষণা কাজে সাহায্য করেছেন প্রফেসর ড. সিদ্দিকা মাহমুদা ও প্রফেসর ডঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ।

গবেষণা কাজে আমি ব্যবহার করেছি ব্যক্তিগত সংগ্রহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী। এছাড়া আমার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ সাঈদ উর রহমান, আমার বড় বোন সালমা আক্তার, স্বামী আবদুল হান্নান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মচারী শাহিনুজ্জামান আমাকে বই সংগ্রহের কাজে সহায়তা করেছে। একাজেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ আমার মূল প্রেরণা হয়ে আছেন। সবশেষে আমি এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, কর্মচারীবৃন্দ ও সুহৃদদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রস্তাবনা

বিশ শতকের তিরিশের দশকের খ্যাতিমান সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিত্র সৃষ্টির পরিকল্পনায়, কাহিনীর বাস্তবধর্মিতায়, রচনা নৈপুণ্যে, ঘটনাংশের একমুখিতায় সাবলীল ভাষা এবং নাট্যিক গতিশীলতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য। উত্তর-সাময়িক কালের মানুষ হয়েও তাঁর অধিকাংশ নায়ক-নায়িকা যুগসৃষ্ট বিচ্ছিন্নতা-অসংগতি, নির্বেদ আর যৌবনরাগ অতিক্রম করে অন্তিমে সন্ধান করেছে মানবিক অন্তঃসঙ্গতি।

সাহিত্যে বিভিন্ন চরিত্র উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। তেমনি মানিকের গল্পেও উঠে এসেছে ছিন্নমূল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বহুমাত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঔপনিবেশিক শাসনজাত নানা অসঙ্গতি আদিম জৈবিক আসক্তি এবং মার্কসীয় বিশ্বদর্শনের আলোয় মানবিক উত্তরণ। এছাড়াও মধ্যবিত্ত জীবনের নানা অসঙ্গতি, ভন্ডামি, প্রতারণা, ছলনা, বিকার, নির্বেদ, অন্তঃসারশূন্যতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পে মধ্যবিত্ত জীবন বাস্তবতা বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়েছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে অভিসন্দর্ভটি বিন্যস্ত হয়েছে- ছয়টি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে জন্ম-শৈশব-বেড়ে ওঠা-শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা-জীবনাভিজ্ঞতা- জীবিকান্বেষণ-বিবাহ-সাহিত্যচর্চা-রাজনীতি-জনপ্রিয়তা-জীবনাবসান সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে বাংলা মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, তার বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধায়ের আবির্ভাব এবং ছোটগল্প সম্পর্কে চিন্তাধারা জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনার শিরোনাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন বাস্তবতা জানার জন্য ২৭টি গল্প বেছে নেয়া হয়েছে। গল্পগুলো হচ্ছে-'অতসী মামী, বৃহত্তর মহত্তর, আত্মহত্যার অধিকার, অন্ধ, ফাঁসি, টিকটিকি, বিপত্নীক, শৈলজ শিলা, সিঁড়ি, প্যাঁক,

সরীসৃপ, সমুদ্রের স্বাদ, ভিক্ষুক, আততায়ী বিবেক, একটি খোয়া, মেয়ে, যে বাঁচায়, নমুনা, যাকে ঘুষ দিতে হয়, ছাঁটাই রহস্য, টিচার, ফেরিওয়ালা, লাজুকলতা-মহাকন্টকটিকা কিংবা, মরব না সস্তায়, ধর্ম ও একান্নবর্তী, এই ২৭টি গল্পে কিভাবে মধ্যবিত্ত জীবন এসেছে তা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে উপসংহার। আলোচনার সামগ্রিক সারাৎসার সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য কর্মের পরিচয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে কল্লোলীয় উচ্ছ্বাস থেকে যাদের সাধনায় বাংলা সাহিত্য ফিরে পেয়েছিল নিরুচ্ছ্বাস সংহতি ও সুসমঞ্জস পরিণতি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের একজন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯ মে মঙ্গলবার, ১৯০৮, বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ, জন্মস্থান সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকা শহর। আদি পৈতৃক নিবাস ঢাকার, বিক্রমপুরের সিমুলিয়া গ্রাম, কিন্তু লেখকের পিতামহ করুণাচন্দ্র মালপদিয়া গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে লালিত পালিত হন এবং আজীবন সেখানেই বসবাস করেন। সেই সূত্রে মালপদিয়াই তাঁদের পৈতৃক নিবাসরূপে গণ্য হয়। লেখকের মাতুলালয়, মালপদিয়ার প্রায় দশ মাইল দূরবর্তী গাওদিয়া গ্রাম। পাঠকমাত্রই জানেন লেখক তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় গাওদিয়া নামটি-ব্যবহার করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। কিশোর বয়সেই লেখক মাতৃহারা হন। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরদা দেবীর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা চৌদ্দ, যদিও পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবিত পুত্রকন্যা দশজন। লেখক তার পিতামাতার পুত্র। লেখকের পিতৃদত্ত পোশাকি নাম প্রবোধকুমার, ডাকনাম মানিক; লেখক হিসাবে ডাকনাম ব্যবহারের কাহিনী তিনি নিজেই পরবর্তীকালে তাঁর 'গল্প লেখার গল্প' – নামক রচনায় বলেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং পরে সাবডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। পিতার চাকরিসূত্রে মানিক পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন ও থেকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষারম্ভ। পরে পড়েন বিভিন্ন স্কুলে-টাঙ্গাইলে, কাঁথি মডেল হাইস্কুলে, মেদেনীপুর জেলা স্কুলে। মেদেনীপুর জেলাস্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯২৬)। তারপর বাকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন থেকে প্রথম বিভাগে আই,এস,সি পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ (১৯২৯)। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি,এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু ততদিনে সাহিত্যচর্চার নেশা জমে উঠেছে। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দেই লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ – 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'অতসী মামি' নামক গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে (পৌষ ১৩৩৫) ফলে বি,এস-সি পরীক্ষায় দুবারই অকৃতকার্য হন (১৯৩১, ১৯৩২)। সাহিত্যকর্মে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েন যে একাডেমিক শিক্ষার ইতি ওখানেই ঘটে।

সাহিত্যই ছিল মানিকের উপার্জনের উপায়। দু-এক বার সাহিত্য সম্পৃক্ত দু-একটি কর্ম থেকে জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করেন। ১৯৩৪ সালে কয়েক মাস ১০/বি পঞ্চানন ঘোষ লেন থেকে প্রকাশিত 'নবারুণ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৯ সালে অনুজ সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধায়ের সহযোগিতায় 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামে প্রেস ও প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই মানিকের পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ; প্রথম প্রকাশিত হয়–প্রথম সংস্করণে (১৯৪০) আটটি গল্প ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৬) যুক্ত হয় আরও পাঁচটি। প্রেস চালাতে পারেননি। ১৯৪৩ সালে ভারত সরকারের পাবলিসিটি এ্যাসিসট্যান্ট পদে কয়েক মাস অধিষ্ঠিত ছিলেন। লেখাই ছিল মানিকের মূল পেশা। ১৯৪৩ সালে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সদস্য। ১৯৪৪ সালে ফ্যা-বি-লে-ওশি-সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমন্ডলির অন্যতম সদস্য। ১৯৪৫ সালে 'প্রগতি' লেখক সংঘের সভাপতি মন্ডলির সদস্য। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা। ১৯৪৯ সালে সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর চার পুত্র-কন্যা। শান্তা ভট্টাচার্য, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা চক্রবর্তী ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিকের চৌদ্দ ভাই-বোনের সংসারে পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন দশ ভাইবোন। মানিক ছাড়া অন্য সকল ভাইই আর্থিক বিবেচনায় ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসকের পেশাসূত্রে রাঁচিতে স্থায়ী মধ্যমভ্রাতা ছাড়া অন্য ভ্রাতাগণ কলকাতয় নিজ নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন। একমাত্র ব্যতিক্রম মানিক-সংকীর্ণ পরিসরের ভাড়া বাড়িতে তিনিই ছিলেন দারিদ্রলাঞ্ছিত জীবনের দায়িত্ব ভারে ক্লান্তশ্রান্ত। মানিকের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডক্টর সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আবহতত্ত্ববিদ। কিছুকাল তিনি ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের আবহাওয়া বিভাগের মহাপরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদে তিনিই ছিলেন প্রথম বাঙালি কর্মকর্তা। মানিকের তৃতীয় ভ্রাতাও ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে এবং পরবর্তি দুইজন, বিশেষত সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৮ সাল থেকে মানিকের স্থায়ী কলকাতা জীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হয়– জ্যৈষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা ভিন্ন অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে – একান্নবর্তী গৃহসংলগ্নতায়।

বৃদ্ধপিতাসহ চারভ্রাতার এই সংঘবদ্ধ জীবনে অর্থদৈন্য তাঁকে অনাকাঙ্ক্ষিত নানা বিরূপ পরিস্থিতি ও বৈরী আচরণের সম্মুখীন করেছে। পিতৃগৃহ বিক্রির পর ভাড়াবাড়িতে ওঠার ক্লেশ সত্ত্বেও মানিক তাই বলেন "হিমাংশুদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে হবে না– যেখানেই যাই। বহুদিন প্রায় ৮/৯ বছর এক বাড়িতে থেকে সব একঘেয়ে হয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক জীবনের ক্লেদময় অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি মানিকের বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টিতে কলকাতার এই পারিবারিক পরিবেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বন্ধনমুক্ত শৃঙ্খলশূন্য কৈশোরে শ্রমজীবী জীবন ঘনিষ্ঠতা এবং তখন থেকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্নেহশূন্য দাযিত্ব সর্বস্ব যান্ত্রিক আচরণের পটভূমিতে মানিকের মধ্যে ভদ্রলোকজীবনের প্রতি-ঘৃণা ও বিরূপতা জন্মলাভ করে। টাঙ্গাইলে যখন তিনি সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন পরিবারের প্রতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার কর্তব্য নিয়ে এমন এক পত্র লেখেন যা পড়ে তিনি ক্রুদ্ধ হন। মানিকের শিক্ষাব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব ছিল জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপর, কিন্তু অগ্রজের কাছ থেকে অর্থপ্রাপ্তিসূত্রে মানিক তাঁর অর্থপ্রেমী উচ্চাভিলাষী সংকীর্ণচিত্তের এমন পরিচয় লাভ করেন যে, জ্যেষ্ঠ সম্পর্কে সকল শ্রদ্ধা হারান। অন্যদিকে অগ্রজের যন্ত্রবৎ নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে মানিকের অকস্মাৎ শুরু লেখক জীবনের অনিবার্য সংঘাতে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অর্থপ্রদান যেমন বন্ধ হয়, তেমনি মানিকেরও বিএসসি পাস অসমাপ্ত থাকে। অতঃপর ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট লেখা মানিকের অন্তত চারটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়–যার তিনটিই অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রচিত, অবশিষ্ট চিঠিটি দীর্ঘ এবং পরিবারের প্রতি অগ্রজের নির্মম আচরণের বিবরণ ও তা থেকে তাকে বিরত হওয়ার পরামর্শদানসহ উপস্থাপিত। মানিকের অর্থসংক্রান্ত আবেদনের প্রতিটি চিঠিই অগ্রজ কর্তৃক নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। মানিকের এইরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তিক্ততার সঙ্গে যুক্ত হয় সমগ্র পরিবারের প্রতি সুধাংশুকুমারের স্নেহ ও সহানুভূতিশূন্য আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের বেদনাদগ্ধ পীড়ন।

উপরিউক্ত চিঠিটি ছাড়াও মানিকের সঙ্গে তাঁর অগ্রজের নিবিড় পরিচয়, পিতার সঙ্গে কথোপকথন ভিত্তিতে রচিত মানিকের ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৯ এর ডায়রিলিখন-এ নিপুণভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। ছাত্রজীবনে কলকাতার হোস্টেলে পিতার সঙ্গে সুধাংশুকুমারের অভদ্রোচিত অভক্তিপূর্ণ ঔদ্ধত্য, বিবাহিত জীবনে মায়ের চিকিৎসায় অবহেলা ও অনাগ্রহ, স্কলারশিপের টাকায় শিক্ষাগ্রহণ জনিত অহংকার দাঙ্গাবিধ্বস্ত বিপৎকালে তাঁর বাড়িতে আশ্রিত সমগ্র পরিবারের প্রতি সমাদরে কার্পণ্য ও কুণ্ঠা প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে এই ডায়রিলিখনে-এ।

১৯৪৯ সালে পিতৃগৃহ বিক্রির সময়ে মানিক জ্যেষ্ঠ ছাড়া অন্য ভ্রাতাদের অর্থলোলুপতা প্রত্যক্ষ করেন। রাঁচি থেকে মধ্যমভ্রাতা জানান, যেদিন বাড়ি বিক্রির টাকা মিলবে সেদিন সকালেই তিনি আসবেন, তার আগে নয়। মানিক ছাড়া অন্য সকলের সচ্ছল আর্থিক অবস্থান সত্ত্বেও পিতৃ সম্পদের অংশ লাভের ক্ষেত্রে তাঁরাই অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করেন।

সংগতিপন্ন ভাইদের মধ্যে মানসিক দিক থেকে শত বিভেদ-বিপত্তি সত্ত্বেও কেবল সচ্ছলতার কারনে যে সুক্ষ্ম আত্মীয়বোধ ক্রিয়াশীল-সে বিষয়েও মানিক সচেতন হন। বাড়িবিক্রির অর্থ ভাগ-বাটোয়ারার দশ মাসের ব্যবধানেই মানিকের বৃদ্ধ পিতা সচ্ছল পুত্রদের সংসারে অপ্রয়োজনীয় ভারে পরিণত হন। কলকাতার তিনপুত্রের নিজস্ব বাড়ি থাকা সত্ত্বেও মানিকের সংকীর্ণ পরিসর ভাড়া বাড়িতে পিতাকে আশ্রয় নিতে হয়। আরও একবছর পরে পিতা কোথায় থাকবেন তা নিয়ে ভাইদের হীনতা স্বার্থবুদ্ধি ও ভদ্রলোক সুলভ মানসিকতা প্রকটরূপ লাভ করে। এ নিয়ে অনুজের কাছ থেকে অপমান জনক আচরণের শিকার হন তিনি। ১৯৫৫ সালে শুভানুধ্যায়ীদের অর্থসাহায্যে মানিক যখন হাসপাতালে প্রেরিত হন, তখন পত্রিকায় ওই সংবাদ পাঠ করে অনুজ ছুটে আসেন লজ্জা প্রকাশ করতে, এই বলে যে, এতগুলো সক্ষম ভাই থাকতে মানিককে চাঁদা সংগ্রহ করে হাসপাতালে পাঠানো হলো অথচ তাদের খবর দেয়া হলো না। তবে এই লজ্জা প্রকাশের মধ্য দিয়েই যেন তাদের দায়িত্ব শেষ হয়।

২২ মার্চ ১৯৫৫ তারিখে মানিকের হাসপাতালে থাকা অবস্থায় মধ্যমভ্রাতার কাছ থেকে একশত টাকা প্রেরণের এক আশ্বাসমূলক চিঠি ছাড়া অন্য ভ্রাতাদের কোন উদ্যোগের তথ্য পাওয়া যায় না।

১৯৫৫ সালে দু-পর্যায়ে মানিক তিন মাসেরও অধিককাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকেন। প্রথমবার হাসপাতাল থেকে যেদিন বাড়ি ফেরেন। সেদিনই জ্যেষ্ঠকন্যা দুর্ঘটনায় পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হয়। তারপর প্রায় বছরকাল সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকে। ওই

বছর তাঁর বৃদ্ধ পিতাকেও কিছুদিন হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাতে হয়। নতুন নতুন রোগের আক্রমণে মানিক আরও বিব্রত পর্যদুস্ত। এমনকি জুনে একবার 'মৃত্যুদর্শনও' হয়ে যায়। নিজের নিয়ন্ত্রণহীন অসুস্থতার মধ্যেই মেয়ের দুর্ঘটনা, পিতার হাসপাতাল চিকিৎসা প্রভৃতির প্রচন্ড মানসিক চাপের পীড়নে মানিকের ক্রমবিলীয়মান সত্তার শক্তি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা সফল হওয়ার কোন সুযোগই পায় না।

ফলে দুবারের হাসপাতাল চিকিৎসাও মানিককে আর সুস্থ করতে সক্ষম হয় না। এর আরও কারণ সুরাসক্তি পরিত্যাগে অপারগতা ও আর্থিক অনিশ্চয়তা। এরই মধ্যে ১৯৫৬ র এপ্রিলেও জ্যেষ্ঠকন্যার ভাঙা পা নিয়ে হাসপাতালে ছোটাছুটির পাশাপাশি বাড়িওয়ালার মামলা নিয়ে উকিলের পেছনেও দৌড়াতে হয় তাঁকে। সংসারব্যয় ও অর্থচিন্তার কোন সুরাহা হয় না। এমন বিড়ম্বনাময় নিঃস্ব-রিক্ত শক্তিহীন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকা কেবল কঠিন নয়, পুরোপুরি অসম্ভব ও 'উদয়াস্ত খাটুনি, অর্থাভাব, আরো খাটুনি, তা থেকে মুক্তির জন্য সুরাসক্তি, অসুস্থতা, আরো খাটুনি এই অন্ধ বৃত্তের মধ্যে পাক খেয়ে চলতে থাকে তাঁর জীবন। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য অনবরত লেখা, উদ্বেগ থেকে মুক্তির জন্য সুরাসক্তি; এই অন্ধ চক্রাবর্তনে মানিক খুব দ্রুত আত্মক্ষয় করছিলেন। শেষ পর্যন্ত যকৃতের রোগ, রক্ত আমাশয় ও মৃগী রোগ একসঙ্গে আক্রমণ করে এই প্রতিভাবান লেখককে ভূপাতিত করলো। ব্যক্তিগত রোগ, আসক্তি, সংসারব্যয় প্রভৃতি নিয়ে জীবনের অন্তিম আটবছর মানিক এমন বিপর্যস্তপ্রাণ যে, রাজনৈতিক বিশ্বাস অটুট থাকলেও সমাজকল্যাণ কামনায় সক্রিয় হওয়ার তেমন অবসর জোটে না। এ ধরনের অস্তিত্ব-সংকটকালে মহৎ চিন্তা বা মহৎ কিছু সৃষ্টিও নিঃসন্দেহে কঠিন। মানিক বন্দোপাধ্যায় ১৯৫৬ সালে মারা যান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় উপন্যাস গল্প-নাটক-গ্রন্থাবলি মিলিয়ে ৫৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম গ্রন্থ 'জননী' উপন্যাস, ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত। সর্বশেষ গ্রন্থ 'মাশুল' উপন্যাস, ১৯৫৬ সালে, মৃত্যুর এক মাস আগে প্রকাশিত। মানিকের মৃত্যুর পরে তাঁর

উপন্যাস-গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-রচনাবলি মিলিয়ে অন্তত ২৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তেরো খন্ডে প্রকাশিত 'মানিক গ্রন্থাবলি' (১৯৬৩-৭৬) এবং "প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" (১৯৭৬)।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ষোল

১। অতসী মামী (১৯৩৫)

২। প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)

৩। মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮)

৪। সরীসৃপ (১৯৩৯)

৫। বৌ (১৯৪৩)

৬। সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩)

৭। ভেজাল (১৯৪৪)

৮। হলুদ পোড়া (১৯৪৫)

৯। আজকাল পরশুর গল্প (১৯৪৬)

১০। পরিস্থিতি (১৯৪৬)

১১। খতিয়ান (১৯৪৭)

১২। মাটির মাশুল (১৯৪৮)

১৩। ছোট বড় (১৯৪৮)

১৪। ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)

১৫। ফেরিওলা (১৯৫৩)

১৬। লাজুকলতা (১৯৫৪)

এই গ্রন্থাবলির বাইরেও মানিকের বহু অগ্রন্থিত রচনা পত্র পত্রিকায় প্রকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে আজো।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সমকালীন সব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে– 'বিচিত্রা', 'বঙ্গশ্রী', 'পূর্বাশা', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'সত্যযুগ', 'প্রবাসী', 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'নরনারী', 'নতুন বাজার', 'বসুমতী', 'গল্পভারতী', 'মৌচাক', 'পাঠশালা', 'রংমশাল', 'নবশক্তি', 'স্বাধীনতা', 'আগামী', 'কালান্তর', 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য', 'দিগন্ত', 'সংস্কৃতি', 'স্বাধীনতা', 'আগামী', 'কালান্তর', 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য', 'দেশ', 'মুখপত্র', 'প্রভাতী', 'অনন্যা', 'উল্টোরথ', 'এলোমেলো', 'ভারতবর্ষ', 'মধ্যবিত্ত', 'চতুষ্কোণ', 'ক্রান্তি', 'হিমাদ্রি', 'শারদশ্রী', 'অগ্রণী', 'সংবাদ', 'শারদী', 'সোনার বাংলা', 'সচিত্র-ভারত', 'কৃষক', 'পূর্ণিমা', 'রূপান্তর', 'স্বরাজ', প্রভৃতি পত্রিকায়।

তথ্য সূত্র

১। বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা কথা সাহিত্য পাঠ, (ঢাকা; বাংলা একাডেমী-মে, ২০০২)

২। যুগান্তর চক্রবর্তী, সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : দ্বন্দ্বের দুই মুখ, (কলকাতা; ১৫, শ্যামচরণ দে স্ট্রিট, ২০০৮)

৩। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প, (ঢাকা; বাংলা বাজার, ১৯৯৯৮)

৪। সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যবিত্ত শ্রেণি

ইউরোপ থেকে আসা নতুন শ্রেণি বিন্যাসের তরঙ্গে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকাশ ঘটে। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত অনড় সমাজব্যবস্থায় সৃষ্ট ধাক্কা ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানকে নতুনভাবে সূচিত করে। বিশ্বপ্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে স্বচ্ছন্দ পদচারণার আহবান, স্ব-প্রতিভার মহিমা প্রকাশের বোধ, স্বীয় উদ্যম ও কর্মপ্রয়াসে আপন ভাগ্যকে জয় করার মধ্য দিয়ে প্রাতিস্বিকতার প্রকাশের শুরু এই যুগেই। এ ছিল বুর্জোয়া বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য অবদান। এই বিপ্লবের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয় এক মধ্য শ্রেণির। প্রাচীন যুগের প্যাট্রিশিয়ান–প্লিবিয়ান, দাসযুগের প্রভু-ক্রীতদাস, সামন্তযুগের জমিদার–ভূমিহীন চাষির প্রত্যক্ষ শোষক-শোষিত-সম্পর্ক ছাড়াও এক নতুন স্বতন্ত্র শ্রেণির আবির্ভাব বুর্জোয়া সভ্যতার অঙ্গ, বুর্জোয়া সমাজের এক অপরিহার্য ক্রিয়াশীল দ্বন্দ্বময় সত্তা, বুর্জোয়া সমাজ সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এক নতুন মধ্য শ্রেণি সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে পরিচিত লাভ করে, স্বতোৎসারিত না হলেও শিল্প বিপ্লবের পরোক্ষ ফল হিসেবেই ভারতবর্ষেও এই সময় থেকেই আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয়। ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসে কমবেশি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, কিন্তু ইউরোপে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-মালিক কিংবা প্রলেতারিয়েত-বুর্জোয়া সম্পর্কের যে পরিবর্তন ঘটেছিল ভারতবর্ষে তা ঘটেনি। শিল্প বিপ্লবের যে ফল পশ্চিমি পুঁজিবাদী গোষ্ঠী খুব সহজেই আশীর্বাদ হিসেবে পেয়েছিল ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী শ্রেণির ভাগে তা সম্ভব ছিল না। ফলে ভারতবর্ষে আধুনিক বুর্জোয়া বিকাশ জন্মলগ্নেই পঙ্গু হয়ে পড়ে। বুর্জোয়া বিকাশ তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের এই তারতম্য কে সমাজতাত্ত্বিকরা তুলে ধরেছেন-æIn the west especially in England, for example, the middle

classes emerged basically as a result of economic and technological change; they were for the most part engaged in trade and industry. In India, on the contrary, they emerged more in consequence of changes in the system of law and public administration than in development, and they mainly belonged to the learned profession"[১]। তাই দেখা যায় ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গাঁটছড়া বাঁধা মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রজাত নানান মূল্যবোধের সঙ্গে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির রূপ গঠনের প্রভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক ইতিহাসের ভাঙ্গাগড়া প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস বিভিন্নভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে দেখিয়েছেন। Engels, inthe preface to 'The condition of the working class,' wrote that he had used the word mittleklasse in the sense of the English middle class or middle classes corresponding with the French bourgeoisic, to mean that part of the possessing class differentiated from the aristocracy', and he repeated this usage in describing in the feudal system (socialism: utopian and scientific)[২]

মার্কস অবশ্য এই টার্মে 'Petty-bourgeoisic' এর ক্ষেত্রে bourgeoisic এবং the working class র মধ্যে দুটো ভাগ করেছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পুঁজিবাদের উন্নয়নের সাথে সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Marx Engels মধ্যশ্রেণির পদ্ধতিগত পার্থক্য করেননি। উভয়ের মাঝে কিংবা লক্ষণীয় পুরাতন মধ্যশ্রেণি, ক্ষুদ্র উৎপাদক, কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং নতুন মধ্যশ্রেণি হলো কেরানী, সুপারভাইজার, কারিগর, শিক্ষকবৃন্দ এবং সরকারী চাকুরিজীবী ইত্যাদি।

---

[১] সাহেদ মন্ডল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ড্রালে কথকতা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ: ২৯-৩০

[২] Tom Bottomore Edited by 'A Dictionary of Marxist Thougt' UK, 1983, পৃ: ৩৩৩।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা ও উপবিভাগ–

সমাজ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি মধ্যবিত্ত এই শ্রেণির উপরে নিচে রয়েছে আরো দুটি স্তর। এর একটি হলো উচ্চবিত্ত যাদের অবস্থান মধ্যবিত্তের উপর। আর অন্য শ্রেণিটি হলো বিত্তহীন। যাদের অবস্থান সমাজের সবচেয়ে নিচু তলায়। অবস্থান বিবেচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব জটিলতর। কেননা এই শ্রেণির প্রথম তিন প্রবণতা আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এর একটি হলো স্ব-অবস্থান ধরে রাখা, দ্বিতীয়ত উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তৃতীয়ত বিত্তহীন শ্রেণিতে নেমে আসার আশঙ্কা। এই ত্রিধা মধ্যবিত্তের মানসলোকে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

মধ্যবিত্তের মানস প্রবণতা জানতে হলে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ জরুরী। তবে এ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়। থাকে ভুল বোঝার আশঙ্কা। সে আশঙ্কা নিয়ে আমরা মধ্যবিত্তের স্বরূপ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হতে পারি। এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই বেছে নিতে পারি ইংল্যান্ডকে। কেননা ভারতবর্ষ ও আমাদের বিচার্য বিষয়ে এর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। কাজেই দেখা যেতে পারে ইংল্যান্ডে কাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিকাশের শুরুতে বুর্জোয়ারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত ছিল। সেখানে এমনটি হবার কারণ বুর্জোয়ারাই পুঁজিবাদী সঞ্চয় থেকে সম্পদের মালিক হয়।

কিন্তু ভূ-স্বামীরা সনাতন ভিত্তিতে কেবল ভূমি নিয়ন্ত্রণের ওপরে নির্ভরশীল থেকে যায়। ভূ-স্বামী বা ব্যারণদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন অবস্থান নেয়ায় সেখানে বুর্জোয়ারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মধ্যবিত্তের সেই শেণি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মধ্যবিত্তের সেই শ্রেণি-চরিত্র স্থায়ী রূপ পায়নি পরবর্তীকালে মানসিকতার পরিবর্তন আসে। পরিবর্তিত মানসিকতায় ইংল্যান্ড বা অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে এমনকি বর্তমানযুগের ভারতেও বুর্জোয়ারা সর্বোচ্চ মর্যাদা ভোগকারী প্রভাবশালী শ্রেণি এবং তাই সে সব দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে বুঝায় বুর্জোয়াদেরকে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি চিহ্নিতকরণে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মানসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে ধরা যায়। এ আলোকে আমরা বলতে পারি-

"মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিত্তবানের সংস্কৃতির অনুসারী। ভূমি, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ কায়িক শ্রমে নিয়োজিত লোকদের পরিশ্রমজাত সম্পদের একটি অংশই এই শ্রেণি ভোগ করে, অথচ এরা নিজেরা সাধারণত কোন কায়িক শ্রমের কাজ করে না, বুদ্ধি কিংবা বিদ্যা এদের প্রধান অবলম্বন। এই শ্রেণি সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবাদী আধুনিকায়নে প্রতি বিকাশ লাভ করে। এদের মধ্য থেকেই আধুনিক বিত্তবানের (বুর্জোয়া পুঁজিপতি) উদ্ভব হতে পারে।

তাদের কেউ নেমে আসতে পারে সর্বহারা শ্রেণিতে। সম্ভবত একারণেই কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ মধ্যবিত্তকে একটি শ্রেণি হিসেবে ধরতে চান না। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তকে প্রধানত চারটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা যায়-

(১) বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত (২) শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত (৩) ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্ত

(৪) পেশাজীবী মধ্যবিত্ত

মধ্যবিত্তকে আবার উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্য মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও এসব উপবিভাগে বিন্যস্ত করা যায়-

উচ্চ মধ্যবিত্তঃ

মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপরিভাগে এদের অবস্থান। এরাই মূলত সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষকর্তা, বড় ও মাঝারি ব্যবসায়ী, কালোবাজারি এবং মধ্যস্বত্বভোগী। এদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাল। উদ্বৃত্ত অর্থও রয়েছে। কৃত্রিম অভাব পূরণের সাহস ও সামর্থ্য আছে।

মধ্য মধ্যবিত্তঃ

এ শ্রেণির প্রাচুর্য ও অভাব কোনটাই প্রবল নয়। সীমাহীন অর্থাগমনের কোন উৎস নেই, আয় সীমাবদ্ধ। খরচের আগে ফর্দ করে নিতে হয়। তবে বিলাসিতা এবং আদর্শকে সমান্তরাল রাখার একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এদের অধিকাংশের মধ্যে। মধ্য মধ্যবিত্তের একটি ছোট অংশ জড়িত উপরি আয়, দাওমারা, কালোবাজারি, ইত্যকার সমাজবিরোধী কর্মকান্ডের সঙ্গে। এ বিভাগ রাজনীতি ও শিল্প সাহিত্যের সুদৃশ্য মোড়কে নিজেদের ঢেকে রাখতে বেশ প্রত্যয়ী ও কুশলি।

নিম্ন মধ্যবিত্তঃ

এই শ্রেণির মানুষ চরম অর্থসংকটে নিপতিত। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে রয়েছে বিস্তর অমিল। অর্থাৎ এই শ্রেণির নুন আনতে পান্তা ফুরোয় প্রবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জীবনের বড় অংশ জুড়ে থাকে ব্যর্থতার হাহাকার দীর্ঘশ্বাস। শহর ও গ্রামবাসী নিম্ন মধ্যবিত্তের সংকট একই রকম। এর বড় অংশই শত সংকটেও মূল্যবোধকে ধরে রাখতে চায়।

তবে গ্রামে অর্থনীতির এই নিরেট শ্রেণির বাইরেও অন্য একটি শ্রেণি কাঠামো বিদ্যমান। তা যেমন ছিল হিন্দু সমাজে তেমন ছিল মুসলমান সমাজে। বিনয় ঘোষ এই শ্রেণিকরণকে দেখেছেন এভাবে–

“আসলে গ্রামসমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি-বিত্তনির্ভর ছিল না, কুলবৃত্তিগত ছিল, ব্রাহ্মণ তাঁর কুলবৃত্তির জন্য গ্রাম্যসমাজে অখণ্ড প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, বিত্তের জন্য নয়। বিত্তহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সামাজিক প্রভাব বিত্তবান বণিক কারিগরি ও কৃষকের চেয়ে শতগুন বেশি ছিল গ্রাম্য সমাজে”[৩]।

[৩] মোঃ জহির‍ুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের জীবন সংকট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত থিসিস, ২০০৬, পৃ: ৪৭-৪৯

মধ্যবিত্ত শ্রেণি টিকে থাকার সংগ্রামে জর্জরিত। সীমিত আয়, জোড়াতালি দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালায় নিরন্তর। এদের মধ্যে লোভ-লালসা ও অর্থের প্রতি রয়েছে সুতীব্র আকর্ষণ। মধ্যবিত্তকে লিয়াজোঁ অফিসার বলেছেন চিন্তাবিদ টয়নবি।

শ্রেণি অনুসারে মাঝামাঝি অবস্থান ঝুলন্ত সেতু বন্ধনের মতো। এর এক প্রান্তে নিম্নবিত্ত অন্যপ্রান্তে উচ্চবিত্ত। সেই সেতু দিয়ে মধ্যবিত্ত নিয়ন্ত্রিত বৃত্তে চলাচলের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। মধ্যবিত্ত সেতু নড়বড়ে তবে ভঙ্গুর নয়।

সমাজবিদদের মতে, বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত উদ্ভবকাল ঊনিশ শতক, যার উত্থান ঘটে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যবিত্ত নামের এ নতুন সামাজিক শক্তির ধারক হিসেবে আবির্ভূত হয়। চেতনার দিক থেকে তারা একটি শ্রেণি সংহতি গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করে। যার প্রকাশ ঘটে ১৮৮৫ সালে রাজনৈতিক দল ভারতীয় কংগ্রেস গঠনের মধ্য দিয়ে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় বীজ বপন করলেও পূর্ব বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তের সুস্পষ্ট বিকাশ ঘটে ভারত ভাগের পর।

ইতিহাসে দেখা যায় যুগে যুগে মানুষের গড়ন বদলায়, সমাজে মানুষের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণি থাকে এবং প্রত্যেক স্তর ও শ্রেণির সঙ্গে পারস্পরিক একটা বিশেষ সম্পর্ক ও স্বাভাবিক রীতি। সেই রীতির হাত ধরেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব। ১৯৫৭ এর পরে ইংরেজ জাতি যখন এদেশের শাসন করার অধিকার নিজের হাতে নিয়ে নেয় তখন ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য হিন্দুদের নিয়ে নতুন ভূ-স্বামী, নতুন বণিক শ্রেণি, নতুন বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে হিন্দুদের চেয়ে ১০০ বছরের ও অনেক পরে মুসলিম শিক্ষিত সমাজের উদ্ভব শুরু হয়। লক্ষণীয় যে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে নিচ সমাজের মধ্য থেকে এবং এই শ্রেণি উঠে এসেছে সমাজের একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে।

মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির পুঁথিগত সংজ্ঞা প্রদান অত্যন্ত জটিল বিষয়। তথাপিও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে গ্রেটেনের মত তুলে ধরেন-

"সমাজের সেই শ্রেণিকেই আমরা মধ্যশ্রেণি বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রাথমিক উপাদান"।[৪]

নাজমুল করিম মনে করেন বাঙালি সমাজে মধ্যবর্তী শ্রেণির বিকাশে ইংরেজরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে Permanent Settlement এর ফলে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা আসে। ব্যক্তি ইচ্ছা করলে জমি বিক্রি কিংবা ধ্বংস করে দিতে পারতো। Permanent Settlement এর ফলে উঠতি কিছু জমিদার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশরা আসার আগে মাত্র ৩৫ জন জমিদার ছিল। শিক্ষাটা শুধু তারাই গ্রহণ করতে পারতো।

তিনি মনে করেন সময়ের পরিবর্তনে মধ্যবিত্ত ধারণা change হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক রুচিবোধ এ দুটো গুণ না থাকলে তাকে মধ্যবিত্ত বলা যাবে না।

তবে একথা সত্য বাংলাদেশের একটি বৃহৎ শ্রেণি মধ্যবিত্ত। এই স্বীকৃতি পাওয়া যায় বিনয় ঘোষের কাছে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"বাংলাদেশের নতুন শ্রেণি রূপায়নের ফলে সমাজে যে শ্রেণির বিস্তার হয়েছে সবচেয়ে বেশি এবং অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় যার আধিপত্য ও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণি"।[৫]

মধ্যবিত্ত শ্রেণি শুধু বৃহৎ অবয়বই লাভ করেনি, ক্রমান্বয়ে মধ্যবিত্তকে মোকাবেলা করতে হয়েছে অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি। সংগত কারণে এই শ্রেণির মধ্যে এসেছে তীব্র জটিলতা। এই সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেন–

[৪] বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি (কলকাতা, ১৩৫৫) পৃ: ৬২।
[৫] বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (ঢাকা, ১১৬৮), পৃ: ১৪২

"মধ্যবিত্ত শ্রেণির বর্তমান আকার যেমন বিশাল হয়েছে, তার রূপ হয়েছে তেমনি জটিল। পৃথিবীর সকল দেশেই হয়েছে, বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি"।[৬]

তবে ব্রিটিশ ভারতে মধ্যবিত্ত সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল কেরানি শ্রেণী। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেন-

"চাকরি ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের বাঙালির যে প্রতিশ্রুতি চোখের সামনে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে, সেটি হল কেরানি মূর্তি। উনিশ শতকের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত, দেশের আর্থিক জীবনের বিচিত্র মধ্যেও মধ্যবিত্ত বাঙালির এই কর্মমূর্তিটি অক্ষুন্ন রয়েছে"[৭]।

এই মধ্যশ্রেণির সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবুল কাশেম ফজলুল হক তাঁর 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন- আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে এই নবোত্থিত শ্রেণীটি প্রচলিত সামন্ত-শাসনের চাপ থেকে মুক্ত হবার ও অবাধ বিকাশের আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশে আগত ইউরোপীয় বনিকদের সঙ্গে আঁতাত করতে গিয়ে খাল কেটে কুমির আনে- দেশকে পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত করে। আঠারো শতকের অন্তিমপাদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে এই শ্রেণী একটি ঐতিহাসিক যুগের জন্য নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থান নিশ্চিত করে নেয় এবং নব্য-জমিদার-চাকুরিজীবী-ব্যবসায়ী-মহাজন হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র উনিশ শতক ধরে এই শ্রেণী পরাধীন স্বদেশে বিদেশি শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বদেশের সম্পদ বিদেশি শাসক- শোষকদের হাতে তুলে দিয়ে সেই শাসক শোষকদের উচ্ছিষ্ট লাভ করে বিকশিত হয়।[৮]

তিনি আরও বলেন 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পূর্ব বাঙলায় এই শ্রেণী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল দিক দিয়ে একান্ত বার্ধক্য জীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে এবং দ্রুত

[৬] বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (ঢাকা, ১১৬৮), পৃ: ১৪২
[৭] ঐ, পৃ: ১৪৮
[৮] আবুল কাশেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য (ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ: ৫৭-৫৮

Dhaka University Institutional Repository

অধঃপতনের গহবরে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় বিগত কয়েক দশক ধরে বাঙলাদেশের সমাজ পুনরায় এক ক্রান্তিকাল বা যুগসংক্রান্তির মধ্য দিয়ে চলছে'।[৯]

বঙ্গদূত পত্রিকা মধ্যবিত্তের সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করে লিখে (১৩ জুন ১৮২৯)–

"যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিলনা এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা, হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহাদিগের ,বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে এই মধ্যবিত্ত দিগের পূর্বে সমুদয় ধন ততদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহাদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ দুঃখ অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্বক্ত প্রকরণ ততদ্দেশে সুনীতি বর্তমানের মূলীভূত কারণ হইতে ও হইবেক"।[১০]

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এক সময়ে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই সম্পর্কে–আহমদ শরীফের অভিমতও একই রকম। তিনি মনে করেন মধ্যবিত্তই মাথা ছিল বাঙালির, এখনও আছে।

তারাই সমাজের নেতা। এই মধ্যবিত্ত-ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণ বটে। সমাজে মধ্যভাগে এদের অবস্থান। এরা নিজেদের পাওনা আদায়ে টনটনে। চরমভাবে এরা ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক। এদের মধ্যে ভোগবাদী মনোভাব বিদ্যমান। এরা স্বাধীন শ্রমে বিমুখ। একই কারনে তারা সৃষ্টিতে অনুৎসাহী। মধ্যবিত্ত শ্রেণি শাসক ও নিম্নতর শ্রেণির কাছে সহায়তা প্রত্যাশা করে। এই শ্রেণিটি শাসককে ভয় করে। আর এই ভয় করা থেকে আসে তোয়াজ করার মনোভাব। আহমদ শরীফ আমলাদের সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মিল খুঁজে পেয়েছেন। শিক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণির বড় পুঁজি, নিম্নশ্রেণির মানুষকে তারা ঘৃণা করে। এরা চায় না সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ুক। তারা মনে করে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়লে তাদের প্রতিযোগীর সংখ্যা

---

[৯] ঐ, পৃ: ৫৮

[১০] মোঃ জহির ুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১

বেড়ে যাবে। তাছাড়া ভয়ের কারণ নিম্নশ্রেণির মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠলে তারা আর মধ্যবিত্তকে তোয়াজ করবে না।

বাংলাদেশে ঊনিশ শতকের শেষ দিকে এই ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় থেকে ব্যবসায়ী শ্রেণি রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। বর্তমানে এদের প্রভাব ক্রমাগত বাড়ছে। ইংরেজ শাসকদের প্রবর্তিত অর্থনীতি তথা ভূমি ব্যবস্থা, বাণিজ্য শিল্প আইন, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রের নীতি ও অর্থ ব্যবস্থাই ভারতের অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকদের সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর সূচিত হয় তার প্রকৃতি নিরূপন প্রসঙ্গে নিম্নের উক্তিটি অনুধাবন যোগ্য।

"ইংরেজ শাসনকালে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজে ভাঙন ধরে, জীবন যাত্রা হয়ে ওঠে শহরমুখী, আর অর্থনৈতিক কাঠামোর এই মৌলিক রূপান্তরের সাথে সাথে নতুন শ্রেণি বিন্যাস দেখা দেয়। নবগঠিত এই সব শ্রেণি আবার ঐতিহাসিক নিয়মানুযায়ী নিজেদের ভূমিকা পালন করে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব করে তোলে"।[১১]

বর্তমানে বাংলাদেশে সামাজিক এই স্তর বিন্যাস ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও মননের ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক ভিত্তি একমুখি হয়ে উঠেছে। সমাজ পরিবর্তনে এই শ্রেণির ভূমিকা ক্রমশ কমছে। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব অনেকটা বাণিজ্যিক পুঁজিপতি ও আমলানিয়ন্ত্রিত। নিম্নবিত্ত শ্রেণি স্তর পরিবর্তনে সুযোগও সীমিত হয়ে আসছে।

[১১] মুহম্মদ ইদরিস আলি, বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃ: ৩

তথ্য সূত্র

১। সাহেদ মন্তাজ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্তরালে কথকতা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২

২। Tom Bottomore Edited by 'A Dictionary of Marxist Thougt' UK, 1983

৩। মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের জীবন সংকট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত গ্রন্থ, ২০০৬

৪। বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি (কলকাতা, ১৩৫৫)

৫। বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (ঢাকা, ১৩৬৮)

৬। আবুল কাশেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য (ঢাকা, ১৯৮৮),

৭। মুহম্মদ ইদরিস আলি, বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি (ঢাকা, ১৯৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে মানিক ও তাঁর বিষয় ভাবনা

বিশ শতকের তিরিশের দশকের খ্যাতিমান সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার বদলি প্রবণ চাকরি উপলক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্য ও কৈশোরজীবন কোথাও খুব বেশিদিন স্থিরভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার সুযোগ পায়নি। অখণ্ড বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন শহর ও শহর সংলগ্ন গ্রাম বা বনবাদাড়ে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর শৈশব থেকে কৈশোর কালের দুরন্তচঞ্চল জীবন, সাঁওতাল পরগনার দুমকায় তাঁর জন্ম, অত:পর, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ি ১৯২৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি সূত্রে স্থায়ী কলকাতাবাসের পূর্ব পর্যন্ত মানিককে আড়া, সাসারাম, তমলুক, মহিষাদল, গুইয়াদা, গালবনী, নন্দীগ্রাম, বারাসাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, টাঙ্গাইল,কাঁথি, মেদিনিপুর ও বাঁকুড়ায় এক দীর্ঘ ও বৈচিত্রপূর্ণ পরিভ্রমণ সমাপ্ত করতে হয়। ফলে তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা-গ্রহণের নিরবচ্ছিন্নতা ও বাধাপ্রাপ্ত হয় ব্যাপকভাবে।

ছোটগল্প রচনায় রোমাঞ্চ আছে। এতে গভীর মনঃসংযোগ করতে হয়। এত দ্রুত তালের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চুলতে হয় বলেই মন কখনো বিশ্রাম পায় না। ছোটগল্প লেখার সময়ে প্রতি মুহূর্তে লেখক রোমাঞ্চ বোধ করেন।

মানিকের নিজের ভাষায় : "সারা বাংলায় ছড়ানো গোটা দশেক স্কুল আর মফস্বল ও কলকাতায় গোটা তিনেক কলেজে আমি পড়েছি"।[১২] বাল্যজীবনের একাধিক ঘটনায় মানিকের চঞ্চলমতিত্ব, নির্ভীকত্ব, কৌতূহলপ্রবণতা ও বিবেচনাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিন থেকে ছ-বছর বয়সের ঘটনাবলির মধ্যে রয়েছে: হলদি নদী তীরবর্তী একটি খালে লাল এঁটেল মাটির পাঁকে নেমে লাল কাঁকড়া ধরে কাঁচের বোয়মে ভর্তে গিয়ে কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবে যাওয়া,

[১২] সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ন (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৮) পৃ: ৬

দুমকার বাড়িতে লাফাতে লাফাতে মাছ কাটা মস্ত বঁটিতে নাভির এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত কেটে দু-ফাক করা পেটকে পঁচিশটি 'ষ্টিচ' দিয়ে ডাক্তারের জোড়া লাগানো পর্যন্ত সমস্ত ঘটনায় একটও না-কাঁদা। চিমটে দিয়ে চুলোর গনগনে কয়লা নিয়ে খেলতে গিয়ে জ্বলন্ত কয়লায় পায়ের মাংস পুড়িয়ে গর্ত করার পরও যন্ত্রণায় চিৎকার না-করা, গরম কড়াই থেকে সদ্যপ্রস্তুত রসগোল্লা মুখে পোরার পর-বাড়ির সবাই এসে পড়ায়-পুড়ে গেলেও মুখ থেকে সেগুলি না ফেলে-ধীরে ধীরে গিলে ফেলা ইত্যাদি। এসব ঘটনা মানিকের অপরিসীম সহ্যশক্তি, সর্বমুখী অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসু বৈশিষ্ট্য, দায়িত্বজ্ঞান, ধৈর্যশীলতা প্রভৃতি গুণকেই স্পষ্ট করে তোলে। একান্ত বাল্যকালীন এসব ঘটনার প্রায় সাত বছরের ব্যবধানে টাঙ্গাইলে তের-চৌদ্দ বছরের যে মানিককে আমরা পাই তিনি অসম্ভব রকম অশান্ত প্রকৃতির। ১৯২২ সালে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মানিক কালীপূজার পূর্বে বাজি বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছোট দুভাই সহ মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর শরীর কেটে কাঁচ বের করার সময় ডাক্তারের নির্দেশে সকলকে অবাক করে দিয়ে পুরোপুরি শান্ত ও নির্বিকার ভাব বজায় রাখেন। অগ্রজ হিসেবে নিজের অবস্থানগত বিবেচনাই তাঁকে আহত দুই অনুজের সামনে অবিচলিত থাকতে সাহায্য করে। টাঙ্গাইল-পর্বেই (১৯২২-২৪) মানিক চরিত্রের বেপরোয়া কল্পনাপ্রবণ খেয়ালী ও ডানপিটে বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঁশ হাতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো টাঙ্গাইলের মাঠে-ঘাটে গান গেয়ে বেড়ানো, গাড়োয়ানদের সঙ্গে গল্পগুজবে রাত পার করে বাড়ি ফেরা, নৌকার মাঝিদের সঙ্গে ভাব করে দু-চারদিন তাদের নৌকায় বেড়িয়ে সংগ্রাম চঞ্চল জীবনের স্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনায় মানিকের অতৃপ্তমনের বিশৃঙ্খল ও বৈচিত্র্যময় জীবনপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবিত্ত জীবনকে উপেক্ষা এবং সংগ্রামমুখর শ্রমজীবী জীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল যে দৃষ্টিভঙ্গি মানিক তাঁর সমগ্র লেখক জীবন ধরে বজায় রাখেন, তা গড়ে ওঠার ইতিহাস কিছুটা কিছুটা টাঙ্গাইল জীবনাচারণের মধ্যে সহজলভ্য। মানিকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ি, পাঠ্যবহির্ভূত গ্রন্থ অধ্যয়ন তাঁর কিশোর মনকে অসম্ভবরকম উন্মত্ত ও জিজ্ঞাসাচঞ্চল করে তুলতো। তাঁর ভাষায়–

'.....একখানা বই পড়তাম আর তার ধাক্কা সামলাতে তিন চারদিন মাঠে ঘাটে, গাছে গাছে, নৌকায়, হাট বাজারে মেলায় ঘুরে আর হৈ চৈ মারামারি করে কাটিয়ে তবে সামলে উঠতাম....।[১৩] অন্যত্র মানিক আরও বলেছেন-

..... ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নিচের স্তরের দরিদ্র-জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরালো করে তুলতো। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে। গরীব অশিক্ষিত খাটুয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গ রূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণ আমার কাছে ধরা পড়ে যেতো।[১৪].....

সাহিত্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত পেতাম জবাবের। বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সাহিত্য আবার জাগাতো নতুন নতুন জিজ্ঞাসা। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তাম গল্প উপনাস। গল্প উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাশ করতাম বাস্তব জীবন।

সাহিত্য পাঠসূত্রে হৃদয় মধ্যে জাগ্রত তোলপাড় করা জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরসন্ধানে জীবন সমুদ্রে অবগাহনের এই প্রক্রিয়া, মানিকের পরবর্তী মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার জীবনেও, একই গতিতে অব্যাহত থাকে। মেদিনীপুরের জীবনে মানিকের আকর্ষণের বিষয় ছিল শহরের নোংরা বস্তির অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ, শহরঘেঁষা কাঁসাই নদী, পার্শ্ববর্তী কুড়েঘর সর্বস্ব ছোট ছোট গ্রাম, রেললাইনের ধারের একান্ত ফাঁকা মাঠ এবং শহর পেরিয়ে একটু এগোলেই বিরাট বিশাল শালবন। শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চলে ভদ্র-অভদ্র-ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মেলামেশা হইচই আড্ডা খেলাধুলা, আখড়ায় কুস্তি লড়া, হরিসভায় গান গাওযা, স্কুল পালিয়ে গ্রামে আগুন নেভাতে যাওয়া প্রভৃতির পাশাপাশি মেদিনীপুরের জীবনেই মানিক হয়ে ওঠেন নির্জনতাপ্রিয়

[১৩] সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬-৭
[১৪] ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭

আবেগ প্রবণ। মাঠ-নদী-বনে সঙ্গীহীন ভ্রমণেই তিনি অধিকাংশ সময় তৃপ্তি খোঁজেন। মানিকের এই নৈঃসঙ্গপ্রেম তাঁর বাঁকুড়ার করেজ জীবনে আরও বৃদ্ধি পায়। বাঁকুড়ার হোস্টেল জীবনে মানিক নিয়মিত ধূমপায়ী। কঠোর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক তরুণ। বাঁশি ও গান এ পর্বেও তাঁর জীবনসঙ্গী। অনিয়মিত মদ্যপান, সন্ত্রাসবাদী 'অনুশীলন' দলের সঙ্গে সংযোগ, বন্ধু পরিবেষ্টন এড়িয়ে অধিকাংশ সময়ে একাকি থাকার চেষ্টার, বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তি লাভ, 'সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স কোরে' ভর্তি হয়ে ডিপ্লোমা অর্জন প্রভৃতি তাঁর বাঁকুড়ার জীবনের দু-বছরের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, টাঙ্গাইল মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার জীবনে পাঠ্য বইয়ের প্রতি অনাকর্ষণ ও জীবন সন্ধানে উন্মত্ততা সত্ত্বেও মানিক ম্যাট্রিক ও আই এসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছ-বছর সময়সীমায় (১৯২২-২৮) মানিক যেমন বহুবর্ণিল, বৈচিত্র্যে ভরপুর ও একই সাথে বর্ণহীন জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তেমনি টাঙ্গাইল-কাঁথি-মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার ভিন্ন ভিন্ন ভৌগলিক পরমিন্ডলে থেকে নানা স্থানিক রং ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত নানা প্রাকৃতিক মাধুর্যের সাহচর্যে নিজ কল্পনাশক্তিকে করেছেন সমৃদ্ধ। তাছাড়া ব্যক্তিজীবনেও মানিক নানা ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন। এ সময়কালের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা তাঁর মাতৃবিয়োগ ও চাকরি থেকে পিতার অবসর গ্রহণ (১৯২৬)। বহু ভাইবোনের সংসারে মাতৃহীন অবস্থা মানিককে যেমন বিশৃঙ্খল আবেগদীপ্ত ও নিঃসঙ্গ করে তোলে, তেমনি পরিবার বিচ্ছিন্নতা হোস্টেলবাস এসব কিছুরই মাত্রা বাড়ায়। এই সময় পর্বে পাঠক্রম-বহির্ভূত গ্রন্থ-অধ্যয়নেও মানিক উদ্যমী শ্রমনিষ্ঠ একাগ্র ও সর্বগ্রাহী। মানিকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী "বারো বছর বয়সের মধ্যে বিষবৃক্ষ, গোরা, চরিত্রহীন পড়া হয়ে গিয়েছে"।[১৫]

[১৫] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮

সপ্তম-অষ্টম শ্রেণি থেকে নিয়মিত পড়েছেন মানসী ও মর্মবাণী, ভারতবর্ষ এবং প্রবাসী। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) উপন্যাসের পাশাপাশি কল্লোলপন্থী আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনাও মানিক পড়েছেন। ন্যুট হামসনের (১৮৫৯-১৯৫৫) হাঙ্গার (ইংরেজি অনুবাদ: ১৯২১) থেকে শুরু করে ম্যাক্সিম গোর্কীর (১৮৬৮-১৯৩৬) মাদার (১৯০৬), জর্জ বারনার্ডশ (১৮৫৬-১৯৫০)র নাটক প্রভৃতি বিশ্ব সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি প্রবল আগ্রহ নিয়েই পড়েছেন বিজ্ঞান, বিশেষত যৌনবিজ্ঞান ও মানবমনস্তত্ত্ব। আর সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে প্রয়েডীয় আবিষ্কার সমূহের। স্মরণীয়, মানিকের এই অধ্যয়নকর্ম নিছক পাঠাভ্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি সাহিত্যপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন বিশ্লেষণ-উন্মুখ। নিঃসন্দেহ যে, কল্লোল কালিকলমীয় ধারার সঙ্গেই ছিল তাঁর আত্মিক যোগ, তবু অধ্যয়নসুত্রেই তাঁর বিশ্লেষণ প্রবণ মনে আধুনিকপন্থীদের সাহিত্য ভাবনার ত্রুটিও অনাবিস্কৃত থাকে নি।

আর এভাবেই ঘনিষ্ঠভাবে জীবনকে প্রত্যক্ষ ও নিরীক্ষা করার পর সেই জীবন কিভাবে সাহিত্যে রূপায়িত হলো তার মর্মোদ্‌ঘাটন ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মানিকের মনেও জাগ্রত হয় সৃষ্টিশীল অনুপ্রেরণা। মানিকের শিল্পিসত্তা গঠনের এই প্রক্রিয়া ও ইতিহাসের সঙ্গে সমকালীন বিশ্ব ও ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক স্পন্দনও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে।

১৯২৮ সালটি মানিকের জীবন ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর, আইএসসি পাশের মধ্য দিয়ে বাঁকুড়ার দু-বছরের হোস্টেলবাসের অবসান, প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তিসূত্রে স্থায়ী কলকাতা বাসের আরম্ভ এবং সেই সাথে লেখকজীবনের আকস্মিক সূচনা মান্‌িক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একুশ বছর বয়সী জীবনের এক নতুন গতিবেগ প্রনোদনা ও বিদ্যুদ্দীপ্তি সঞ্চার করে। ফলে নিজ জীবন প্রকল্প অসমাপ্ত রেখে সৃষ্টির উল্লাস ও উন্মাদনাস্রোতের সমান্তরালে তিনি একীভূত করেন তাঁর অবশিষ্ট জীবনের সকল উদ্যম-উদ্দীপনা, স্বপ্ন-আশা ও

কর্মচাঞ্চল্যকে। সতীর্থদের সঙ্গে বাজি রেখে খ্যাতনামা পত্রিকায় প্রথম গল্প-প্রকাশ (ডিসেম্বর ১৯২৮), মুদ্রিত গল্প ও তার পারিশ্রমিকসহ স্বয়ং পত্রিকা সম্পাদক কর্তৃক বাড়ি এসে নতুন গল্প দাবি-করা প্রভৃতি অভাবনীয় ঘটনা সামগ্রী মানিকের জীবন গতির মোড় পাল্টে তাঁর লেখক জীবনে পৌঁছার স্বকপোলকল্পিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ী যাত্রাপথকে সহসা সংক্ষিপ্ত করে দেয়। অতঃপর ছ-মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় গল্প (জুন ১৯২৯) এবং আরও দু-মাস পরে তৃতীয় গল্পের প্রকাশ (আগষ্ট ১৯২৯) কেবল তথ্যমাত্র নয়, ১৯২৯ সালেই তিনি শুরু করেন উপন্যাস রচনা এবং ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত পরবর্তী আট বছর তাঁর জীবনের এক মহামূল্যবান সংগ্রামদীপ্ত সময়-যখন তিনি বিপুল অধ্যয়ন ও সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জনের এক 'প্রাণান্তকর' সাহিত্য সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। পরিণামে সিদ্ধিলাভ হয়ে ওঠে অনিবার্য-অর্থাৎ এ সময়কালে প্রকাশিত পাঁচটি উপন্যাস ও একটি গল্পগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র-পরর্বী বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন পাকাপোক্ত করে দেয়। পরবর্তী তিন বছরে (১৯৩৭-৩৯) প্রকাশিত তিনটি গল্প গ্রন্থেরও অধিকাংশ গল্প রচিত ও প্রকাশিত হয় আলোচ্যসময়পর্বেই। স্মরণীয় যে, কেবল বাংলা সাহিত্যে সমকাল-শ্রেষ্ঠত্ব লাভই প্রারম্ভকালীন আট বছরের এই তপস্যাক্লিষ্ট জীবনের লক্ষ্য ছিল না, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করার এক কষ্টসাধ্য উচ্চস্বপ্ন ক্রিয়াশীল ছিল মানিকের তরুণ মনে। শিশুকাল থেকে সঞ্চিত বিপুলতর অভিজ্ঞতা সমষ্টি ও গ্রন্থবিদ্যাকে মুলধন করে মানিক এ সময়পর্বে সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্তে তাঁর সৃষ্টি সাধনায় ব্রতী হন। ভাবনা ও পাঠের অখণ্ড অবসরের মধ্যে বিপুল উদ্যম, যৌবনশক্তি ও অকাতর শ্রমশীলতা ছিল তাঁর একালের সহায়। বলা বাহুল্য, এই সবকিছুর সম্মিলিত রসায়নক্রিয়া তাঁর সাধনাকে সার্থক ও সফল করে তুলে তাঁকে সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংশয়, হতাশা, ব্যর্থতাবোধ ও অসহায়তাবোধের কাছে পরাজয় মেনে নেননি। মানিকের গল্প পাঠককে কূলহারা জীবন-রহস্যের দিকে ঠেলে দেয় না, সংগ্রামী সংকল্প কঠিন মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি করিয়ে দেয়। বিজ্ঞানবুদ্ধি, সত্যএষণা, বস্তুজিজ্ঞাসা

মানিকের শিল্প মানসের গোড়া থেকেই ভাবালুতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। বিজ্ঞানের ছাত্র মানিক জীবনের সব কিছুতেই 'কেনা'-এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন।

মুখের কথা, 'গল্প লেখার গল্প' (১২মে ১৯৪৫-এ বেতার কথিকা) ও 'লেখকের কথা' (১৩৬৪/১৯৫৭) পুস্তিকা দুটিতে মানিক তাঁর লেখক জীবনের নানা সংশয়ও সমস্যা উত্থাপন করেছেন, লেখক ব্যক্তিত্ব অনেকটাই, উন্মোচিত করেছেন। 'গল্প লেখার গল্প', 'কেন লিখি' (জানুয়ারি-১৯৪৪) 'সাহিত্য করার আগে',–এই নিবন্ধ এর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক জবিনের ম্যানিফেষ্টো। এত স্পষ্টভাবে, এত অকুণ্ঠভাবে আর কোন রবীন্দ্র পরবর্তী কথাশিল্পী নিজেকে উন্মোচিত করেননি।

এগুলি থেকে কয়েকটি উক্তি উদ্ধারযোগ্য ও অনুধাবন যোগ্য।

১। ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই। [গল্প লেখার গল্প]

২। জীবনভাবে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি। দান করি বলা ঠিক নয়-পাইয়ে দিই। তাকে উপলব্ধি করাই। [কেন লিখি]

৩। জীবনকে তো জানতেই হবে, এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু জীবনকে জানাই যথেষ্ট নয়। সাহিত্য কি এবং কেন সে তত্ত্ব শেখাও যথেষ্ট নয়। যে জীবনকে ঘনিষ্ট ভাবে জেনেছি বুঝেছি সেই জীবনটাই সাহিত্যে কিভাবে কতখানি রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে

সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে, নইলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণাও জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না (সাহিত্য করা আগে)।

৪। লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি। মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা, আমি আমদানি করেছি জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও। [তদেব]

৫। ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগলো যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? মানুষ হয় ভালো, নয় মন্দ, ভাল মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয় সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্তের হৃদয়। [তদেব]

৬। বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড়জোড় বেঁধেই এসেছিল কিন্তু বিপ্লব হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না–সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না। জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালি কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না। [তদেব]

৭। হ্যামসুনের দু-একখানা বই পড়েছিলাম। প্রেমেন-বাবুর এই চিঠি (১৩৩৩-এর 'কালি-কলমে' মুদ্রিত) গোর্কির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করতে যাই। মনে আছে 'মাদার' পড়তে

পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম–হ্যামসুন আর গোর্কিকে মেলাবেন কি করে? আমার তখন হ্যামসনেও আপত্তি ছিল না, গোর্কিতেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পাথৃক্য কি ধরা পড়ে না? [তদেব]

৮। শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ-কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসেনি। বস্তি জীবন এসেছে কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি-বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের ভাবাবেগ আসে নি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয়নি। ওই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে। [তদেব]

মানিকের শিল্প প্রতিভা সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমারের মূল্যায়ন স্মরণযোগ্য : "মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে "কল্লোল" ডিঙিয়ে "বিচিত্রায়" চলে এসেছে–পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙায়। আসলে সে "কল্লোলেরই" কুলবর্ধন"।

১৯৩৩-৩৪ সালেই পরিমল গোস্বামী মানিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন স্বাতন্ত্রদীপ্ত আত্মশক্তিতে আস্থাশীল এক শিল্প ব্যক্তিত্বকে: "ব্যবহারে নম্র, কিন্তু ব্যক্তিত্বে কঠোর। চেহারায়, ব্যবহারে, কথায় একেবারে স্বতন্ত্র। আপন মমতা বিষয়ে সচেতন নয়, কিন্তু আত্মশক্তি তার সমস্ত সত্তায় প্রতিফলিত। প্রথমেই তার সম্পর্কে যেটি অনুভব করেছিলাম সেটি হচ্ছে তার ঐ স্বাতন্ত্র্য। সব বিষয়ে সজাগ, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি, অথচ সব বিষয়ে কেমন যেন একটা রহস্যপূর্ণ সুদৃঢ়তা। একটা অবর্ণনীয় ঔদাসীন্য, অথচ তা মধুর এবং মহা আকর্ষক। যা প্রীতিকর, প্রসন্নকর এবং যার প্রতি উদাসীন থাকা অসম্ভব'।

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন belated kallolean' (শ্রেষ্ঠ গল্প)

১৯৪৩ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। আমরা এই হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুচ্ছকে ভাগ করবো দুটি পর্যায়ে ১৯২৮-৪৩ প্রথম পর্যায়, ১৯৪৪-৫৬ দ্বিতীয় পর্যায়। এই বিভাজন কিছুটা কৃত্রিমভাবে সাধিত হলো।

প্রথম পর্যায়ে তাঁর ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে প্রাধান্য অর্জন করেছে দারিদ্রক্লিষ্ট জীবন, মানবমনস্তত্ত্বের নানা অনুন্মোচিত প্রাপ্ত, রোমান্টিক ভাবাবেগ, মনোবিকার এবং বিকারের উৎস হিসেবে আর্থিক দৈন্য, অর্থলালসা, নিরাপত্তাহীনতা, আতঙ্কজনক স্মৃতি, ইন্দ্রিয়তাড়না, অশিক্ষিত মানস, অস্বাভাবিক দেহ বৈশিষ্ট্য, সমাজ শাসন, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি।

মানিকের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুচ্ছে উঠে এসেছে সমকালীন দেশ-কাল; দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশবিভাগ, ঝুটা, স্বাধীনতা, রাজনীতি, মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের সংগ্রামমুখর জীবন, প্রতিবাদ, শ্রেণীসাম্য, জিজীবিষা। কিন্তু একরৈখিক নন এখানেও-বহুমাত্রিক, বহুস্তর, বহির্বাস্তবের সঙ্গে এখানে দেখা গেছে অন্তর্বাস্তব, শ্রেণীচেতনার কথা বললেও যৌনচেতনাকে অস্বীকার করেননি এখানেও।

মোটামুটিভাবে তাঁর রচনার আদি পর্যায়ে ফ্রয়েড-অনুসারী অবচেতনাশ্রয়ী জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপাদান বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, এই পর্বেই আবার এরই প্রায় পাশাপাশি অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ছবি উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আর উত্তরপর্বের রচনায় শ্রমজীবীদের উপর শ্রেণীবৈষম্যজাত পীড়ন ও বঞ্চনা একদিকে অন্যদিকে প্রতিরোধ ও শ্রেণি সংগ্রামের মনোভাব মুখ্য উপাদানরূপে ব্যবহৃত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিককার গল্পে জীবনের প্রতি মমতা অনুপস্থিত। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা ফিরে এসেছে পরবর্তী পর্যায়ের গল্পে। সেখানে যুক্ত হয়েছে মার্কসবাদ থেকে প্রাপ্ত গভীর সমাজচেতনা। এই পর্বে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে, শিল্পবোধ ও সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের ধারণা এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সুস্থ জীবনবোধ বেঁচে থাকার

লড়াইয়ের প্রতি শ্রদ্ধার মূলে আছে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন। দেশবিভাগের পূর্ববৎসরে ও পরবর্তিকালে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলি লেখকের এই ব্যাপক জীবনদৃষ্টির পরিবর্তনের পরিচয়স্থল। এই পর্বে মানিক সুস্থ জীবনবোধ, বলিষ্ঠ বিশ্বাস ও আশাবালি সংগ্রামের রূপকার। সমাজের নীচুতলার মানুষ ও সবচেয়ে দ্বিধাগ্রস্ত যে শ্রেণি, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিয়ে লেখা গল্পে লেখকের এই বিশ্বাসই রূপায়িত হয়েছে যে সংগ্রামের মধ্যেই জীবনের সুস্থতা ও আনন্দ, আর সে আনন্দ বাস্তব বর্জিত নয়, বাস্তবেই তার শিকড়।

তাঁর 'প্রাক-মার্কসিষ্ট' পর্বের গল্পে-উপন্যাসে-সেখানে রূপায়িত মধ্যবিত্তের ভাঙাচোরা কীটদষ্ট প্রায়-বিধ্বস্ত জগৎকে আশ্রয় করে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও-মনে রাখতে হবে-ব্যাধি, মৃত্যুচিন্তা ও অর্থকষ্টে বিড়ম্বিত মানিক। এই সবকিছুর প্রবল প্রতিক্রিয়ায় তাঁর ব্যক্তিসত্তার গভীরে নিশ্চয় আকাঙ্ক্ষা করতেন এক ব্যাধিমুক্ত স্বচ্ছন্দ জীবন।

এই দুই পর্বেই-ব্যক্তির গভীর মনস্তত্ত্বভিত্তিক আদিপর্বের রচনায় ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম-আশ্রয়ী উত্তরপর্বের কথা সাহিত্যে-সর্বত্রই মানিকের আধুনিকতা স্বপ্রকাশ।

স্মরণীয় যে, একটি সুস্থ-সুন্দর স্বাভাবিক জীবনাকাঙ্ক্ষাই মানিককে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ ও মার্কসীয় সমাজদর্শন চর্চায় ব্রতী করে। মানুষের অসংলগ্ন আচরণের মূল তার মনোগত জটিলতার মধ্যেই নিহিত–এমন ধারণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানিক মানবমনের গূঢ়-গভীর রহস্য উন্মোচনে নিবিষ্ট হন।

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব ও মার্কসীয় সমাজদর্শন মানিকের শিল্পি মানসে তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করলেও আসলে এই দুই মতবাদই তাঁর জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে সর্বদা উপরিতলের বিষয়। মানিকের জীবনদর্শনের মৌল অনুষঙ্গ যথার্থ অর্থে তিনটি–বিজ্ঞানবোধ, আধুনিকতা ও বাস্তববাদিতা। এসব বৈশিষ্ট্যসূত্রেই উপর্যুক্ত দুই তত্ত্বাবদর্শ তাঁর শিল্পিসত্তায় লগ্ন হয়েছে। বিজ্ঞানচেতনা মানিকের জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে এক নিয়ন্ত্রকশক্তি। মানিক বিজ্ঞানের ছাত্র

ছিলেন–এটুকু তথ্য তাই তাঁর বিজ্ঞানবোধ অনুধাবনের ক্ষেত্রে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। মানিকের চিন্তা-চেতনা ধ্যান-ধারণার জীবনবোধ ও সমাজচেতনা এই সবকিছুর মূলে সক্রিয় ছিল সুগভীর বিজ্ঞানদৃষ্টি। তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, অর্ন্তলোক অনুধ্যান, গভীর তলাশ্রয়ী মানবমন ও সমাজবিশ্লেষণ প্রভৃতি বিজ্ঞানচেতনারই ফল।

মানিকের ছোটগল্পে সমকালীন যুগ ও পরিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যখন কোন একটা বিষয় বা বস্তুকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি, তখন তা আমরা বিচার করি নিজেদের শিক্ষা, উপলব্ধি, বিশ্বাস, জ্ঞান, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের আলোকে। সাধারণ মানুষ যারা আমারই মতো, তারা হয়তো একজোড়া চোখকে সাধারণ চোখ হিসেবে দেখতে পারে, কিন্তু ঐ চোখের মধ্যে সীমাহীন আকাশের ব্যাপকতা ও অতলান্ত সাগরের গভীরতা সবার কাছে ধরা পড়ে না। মানিকের প্রতিটি গল্পে এরকম যুগ পরিবেশের পরিচয় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যা নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিতবহ। এক্ষেত্রে আমরা তাঁর গল্পে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি ও কিছু কিছু নৃতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের সমন্বয়ে সমাজ বিশ্লেষণ লক্ষ্য করতে পারি। তিনি জীবনের অসাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে দেশ কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের চরিত্রগুলো বা ঘটনা বহু মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে অর্জিত অভিজ্ঞতার দ্বারা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে যা সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমনটিই দাবি করেছেন : "গরিবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করতো-জিজ্ঞাসা জাগতো, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?.....মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবনের প্রেমে যেটুকু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সন্ধান পেতাম না নিচের তলার জীবনে। আবার নিচের তলার প্রেমে ভাবৈশ্বর্যের রিক্ততা সত্তেও যে সহজ বলিষ্ঠ উন্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জীবনে তার অভাবটা ধরা পড়তো। ..... ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভন্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকারগ্রস্ততা,

সংস্কারপ্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্র জীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ? ভদ্র জীবনের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর-মাঝি-মাল্লা-হাড়ি-বাগদীদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা-যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে-সাহিত্যে স্থান পায় না?"[১৬]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধ পূর্বকালের রচনায় মানুষের জীবন, তার আদিমতা, জৈব তাৎপর্য ও আদি-অন্তহীন স্বভাবকে গল্পে শিল্পের মূল্যে যথার্থ রূপ দিয়েছেন, যুদ্ধ-সমকালের রচনায় সাধারণ জীবন থেকে ব্যক্তি মানুষ ধরে তারই ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে সমষ্টি মানুষের সন্নিহিত হতে চেয়েছেন, যুদ্ধোত্তর গল্পে সমষ্টি মানুষের হয়ে সারা পৃথিবীর পক্ষে বড় সমাজ ন্যায়ে সোশিয়ালিজমকে বড় জীবন সন্ধানেও মানবতার স্বরূপ অঙ্কনে বিশ্বাসী থেকেছেন। আবহমানকালের আদি-অন্তহীন জীবনস্বভাব, নাগরিক ব্যক্তির সূত্রে সমষ্টির কথায় চলে আসা, সমষ্টি মানুষের ভিড়ে মহত্তম মানবতায় উদার মুক্ত সমাজ-কল্পনা—এ সবই ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সুরকে চিহ্নিত করে দেয়।

দেখা যাচ্ছে যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী, সেটা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

[১৬] সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৮

তথ্য সূত্র

১। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, ঢাকা।

২। সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ন, এপ্রিল ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, ১৯৮২, কলকাতা।

৪। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্প রীতি, ১৯৮৭, কলকাতা।

৫। সাহেদ মন্তাজ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরালে কথকতা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, ঢাকা।

৬। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, যুগলবন্দী গল্পকার : তারাশঙ্কর মানিক, নভেম্বর, ১৯৯৪, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন-বাস্তবতা

মানিক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন, তিনি দেখেছেন অর্থলিপ্সা ও সরকারি পদমোহ কিভাবে একটি মধ্যবিত্ত সংসারে পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, পারস্পরিক সহানুভূতি-শ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধসমূহ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। মানিকের নিজ পারিবারিক পরিমন্ডলই হয়ে ওঠে তার উত্তম উদাহরণ। আর তারই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে মানিকের সংবেদনশীল হৃদয়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের সম্পর্কে জাগ্রত হয় তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ-বিরূপতা ও অবজ্ঞা। সহরতলী উপন্যাসে মানিক যশোদার মুখ থেকে ভদ্রলোকদের সংজ্ঞা দেন এভাবে–

'ভদ্রলোক কাকে বলে জানো না? চাষা মজুরকে যারা ঘেন্না করে, বড়লোকের পা চাটে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামী দামী জামা কাপড় পরে, আরাম চেয়ে চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমান বোধ থাকে টনটনে কিন্তু যত বড় অপমান হোক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়'।[১৭]

শ্রমঘনিষ্ঠ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও উৎপাদনশীল গ্রাম সমাজ থেকে উন্মুলিত হয়ে ভোগপরায়ণ শহুরে জীবনে অভ্যস্ত এদেশের ভদ্রলোক-মধ্যবিত্ত শ্রেণি ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এমন ঐতিহ্যবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক অভিরুচি সম্পন্ন হয়-যার পরিণতিতে নিজস্ব পারিবারিক পরিবেশ ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের মনে জন্মলাভ করে এক তীব্র অস্বীকৃতিমূলক নেতিবাচক মনোভাব। ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। আজও যার কু প্রভাব থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত নয়। একারণে এদেশের হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারগুলোর ভাঙনের প্রশ্নটিও গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে ওই বিকাশ প্রবণতার সঙ্গে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক ইতিহাস ও

[১৭] পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬

পটভূমি বিশ্লেষণ করলেও আমরা তার স্পষ্ট আভাস পাই। আর এরূপ বিকাশপ্রক্রিয়ার কারণেই মধ্যবিত্তের সংসার আবহে সৃষ্টি হয় যে হীনমন্য স্বার্থপরতা, অনাচার-অবিচার, বিকারগ্রস্ত সংস্কারপ্রিয়তা, ভন্ডামি, মিথ্যাচার ও যান্ত্রিকতা–অতি সতর্ক সংবেদনশীর মানিকের পক্ষে তার স্বরূপ অনুধাবনে বিশেষ কষ্ট হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবে তাঁর মন বিষিয়ে ওঠে : ওইরূপ আত্মকেন্দ্রিক পরার্থপুর-বিমুখ মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে ভাবাবেগের অধিকারী হয়ে তার অভ্যন্তরীণ ক্লেদ ও বিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে পরিপার্শ্ব-সজাগ মানিকের অনিসন্ধিৎসু মন। মানিকের নিজের ভাষায় :

'ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় আর মন, অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক ভাব প্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে! আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্র জীবনকে ভালবাসি, ভদ্র আপনজনদের আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।'[১৮]

মানবমনের গতি প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই হলো আত্মলড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমশুদ্ধতা অভিসারী অভিযানে ব্রতী হওয়া। লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্বেই তাই মানিকের মধ্যে মধ্যবিত্ত চেতনার বিরুদ্ধে আত্মসংগ্রামের প্রবণতা আমরা লক্ষ করি। লেখক জীবনে নিবিষ্ট হওয়ার পর এই অন্তর্সংঘাতই বহির্দ্বন্দ্বে রূপলাভ করে। লেখনীর সাহায্যে তিনি সমাজের মধ্যবিত্ত ভাবাবেগ ও আত্মপ্রতারণাকে নির্মমভাবে আঘাত করেন। সমাজকে ওই বিষয়ে সচেতন করে তার থেকে মুক্তি দানই হয়ে ওঠে যার একমাত্র লক্ষ্য ও অভিপ্রায়। সমাজবাদী তত্ত্বজিজ্ঞাসা মানিককে এ বিষয়ে পরবর্তিকালে আরও সতর্ক ও বিশ্লেষণ-উন্মুখ করে তোলে।

[১৮] ঐ, পৃঃ ২৬

একদা জীবনযুদ্ধের ক্ষত বলে যে-বিকারকে অনুভব করেছিলেন, নতুন সমাজদর্শনের আলোকে তাকেই তাঁর মনে হয় জরাচিহ্ন ভাঙনের ইঙ্গিত। মানিকের স্বীকারোক্তিঃ-

'..... প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মুর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর মর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। তখন জানা ছিল না যে স্বাভাবিক নিয়মে এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল–সংকীর্ণ গন্ডী ভেঙ্গে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।'[১৯]

আমরা লক্ষ করছি যে, অসম্পূর্ণ বিকাশ মধ্যবিত্ত জীবনচেতনার অন্ধকার প্রান্তগুলি মানিকের চিন্তাকাশে উন্মোচিত হওয়ার পেছনে তাঁর পারিবারিক পরিবেশই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সমাজাশ্রয়ী জীবন ভাবনা তাঁর এই চৈতন্যকে অধিকতর শানিত, দীপ্ত ও পরিপুষ্ট করছে মাত্র, স্মরণীয় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পিমানসের তত্ত্ব থেকে তত্ত্বান্তরে পরিভ্রমণের উৎসমূল ও নিহিত তাঁর এই মধ্যবিত্ত চেতনায়।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'মধ্যবিত্ত ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনে, সেই মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষও তিনি। আর এই সমাজের কৃত্রিমতা মুখে রঙ মাখার মত উৎকট জৌলুস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছিল পোশাক-পরা মেকী সভ্যতার আড়ালে যে আদিম স্বভাব আছে, তাকে বিকৃতি-ও ভ্রষ্টতা দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস আছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার যথাযথ সত্যতা চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন।[২০]

---

[১৯] ঐ, পৃঃ ২৭

[২০] ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, যুগলবন্দী, গল্পকার: তারাশঙ্কর মানিক, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ১।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে বলেন "শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলো ও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্ত হৃদয়।"[২১] আসলে তাঁর অভিযোগ, শরৎচন্দ্র তদানীন্তন যুগে আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় মধ্যবিত্তের জীবনের স্বরূপ কি ছিল তার রূপ ফুটিয়ে তোলেননি। এই মধ্যবিত্তের স্বরূপ কী? মধ্যবিত্তের স্বরূপ ও মানিক নির্ণয় করেছেন। মানিকের ভাষায় "ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় আর মন, অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক জন্মপ্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে। আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি ..... এই ভদ্রজীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে"।[২২] তাঁর মতে এটাই মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবন মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবন-নোংরা কদর্য জীবনকে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে না তুলে তার পরিবর্তে তার মহৎ চরিত্র অঙ্কন করা হলো। সেজন্য মানিক প্রশ্ন রাখেন, "ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভন্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকারগ্রস্থতা, সংস্কার-প্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এমিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্র জীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ।"[২৩]

মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রকৃতরূপকে যথার্থভাবে তুলে ধরতে না পারার জন্য মানিক শরৎচন্দ্রের প্রতি যেমন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পিতৃহৃদয়ের স্নেহপ্রবণতাকে সহনীয় করে কাবুলিওয়ালা চরিত্র অঙ্কন করেছেন। কাবুলিওয়ালার প্রকৃত চরিত্রকে উপেক্ষা করে, তার হৃদয়বৃত্তিকে রূপ দেয়া হয়েছে। মানিক মনে করেন, এতে মানুষের প্রকৃত চরিত্র অঙ্কিত হয়নি।

[২১] সাহেদ মন্ডল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫
[২২] ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫
[২৩] ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী মনে করেন 'মানিকের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত নর-নারীর জটিল মনস্তত্ত্ব এবং মধ্যবিত্ত নর-নারী আর্থিক-সংকট ও শ্রমজীবী মানুষের স্তরে তাদের ক্রম অবতরণের ছবি ফুটে উঠেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে দাম্পত্য সম্পর্ককে আশ্রয় করে মধ্যবিত্ত নর-নারীর সচেতন-অবচেতন মনের জটিল তির্যক মনস্তত্ত্বের আলো-আঁধারি ছবি বিশিষ্টতা দান করেছে গল্পের জগৎকে, অন্যদিকে দাম্পত্য জীবনের বাইরে এই মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্বের কুটিল অন্ধকার রূপ আশ্চর্য তীক্ষ্ণতায় আত্মপ্রকাশ করে এই সমাজের নগ্ন রূপকেই যেন অনাবৃত করতে চেয়েছে তাকে নিষ্ঠুর কঠিন ব্যঙ্গ বিদ্ধ করতে।

মানিকের ছোটগল্পে একদিকে তাঁর চোখে ধরা পড়েছে মধ্যবিত্ত চরিত্রের স্ববিরোধ ও আত্মবঞ্চনা 'আপন' অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য জীবনকে বাইরে থেকে সুন্দর, সুখী ও সার্থক দেখাবার নিদারুণ ভন্ডামি, বাইরের আচরণের একরূপের আড়ালে স্বভাব ও মনের সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী গতি। অন্যদিকে তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পৌঁছেছে 'বিকাশের মোহে মূর্চ্ছাহত' মধ্যবিত্ত নরনারীর মনের অস্বাভাবিক রুগ্ন জটিলতায়-যার পিছনে আছে অন্ধ যৌন অবচেতনার এক কুটিল অন্ধকার জগৎ।

আমরা এখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেসব গল্পে মধ্যবিত্ত জীবন বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে। সেরকম ২৭টি গল্প নিয়ে আলোচনা করেছি। গল্পগুলোর নাম পরিশিষ্টে দেয়া আছে।

অতসী মামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প অতসী মামীর (অতসী মামী) দাম্পত্য প্রণয়ের প্রগাঢ় রোম্যান্টিকতা যে-প্রচন্ড অতৃপ্তির মধ্যে নিঃশেষিত হয়, বংশীবাদকের সার্থক সুরধানার যে-রক্তাপরিণতি ঘটে প্রতিনিয়ত, কিংবা অতসী মামীর রোগ-চিকিৎসায় বংশী বাদকের অস্তিত্বরক্ষার দুটি উপায়ই–অর্থাৎ তার বাঁশি ও মাথা-গোঁজার ঠাই বাড়িটি-বিক্রি হয়ে গেলে তার অস্তিত্বসুদ্ধ যে-বিপন্ন হয়ে পড়ে-এসব কিছুর মূলে ওই সীমাহীন দারিদ্র্যই সক্রিয়। অন্যের দান গ্রহণে কুণ্ঠিত, বার্ষিক পাঁচশো টাকা আয়ের জামির মালিক, মূলত ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তমানসের অধিকারী যতীন্দ্রনাথ রায়ের ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে মধ্যবিত্তসুলভ আত্মসম্মানবোধই ক্রিয়াশীল।

এ গল্পে নর-নারীর অবচেতনা বা যৌন ভাবনার কোন পূর্বাভাস মেলে না। গল্পটি মধ্যবিত্ত নরনারীর জীবন ও চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে ঠিকই কিন্তু এখানে মধ্যবিত্ত মানসের ভন্ডামি বা স্ববিরোধের প্রতিফলন নেই, সমগ্র গল্পটি রসসিক্ত হয়ে আছে মধ্যবিত্তের করুণ মধুর প্রেমচেতনায়। এই প্রেমের অবলম্বন দাম্পত্য জীবন, এক বাঁশী-বাজিয়ে শিল্পী ও তাঁর স্ত্রীর দাম্পত্য প্রেমের নিরূপায় বেদনামিশ্রিত এই কাহিনীর শেষে যে রোম্যান্টিক সুর পাঠকমনে অনুরণন তোলে, তার রেশ কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে প্রায় নিঃশেষে হারিয়ে যায়। সরোজমোহন মিত্রের নিকট এ গল্প বিবেচিত হয়েছে সমকালীন জীবনযন্ত্রণার প্রতীকরূপেঃ "তিরিশদশকের রক্ত মুখে ওঠা কঠোর জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে যতীনমামার যন্ত্রণাকাতর জীবনের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে আর প্রতি পদে পদে মার খাওয়া জীবন-চেতনার সঙ্গে পরাজিত নায়কের মর্মযন্ত্রণার অপূর্ব মিল আছে। সেজন্য তিরিশ দশকের মর্মান্তিক এই গল্প মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনবেদ হয়ে উঠেছিল"।

'বৃহত্তর মহত্তর' গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী গল্প। এ গল্পে মানিক মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, ক্রুরতা, হিংস্রতাও পাশবতার নগ্ন রূপ উদঘাটিত করেছেন। ভদ্র মধ্যবিত্ত পোষাকের আড়ালে যে হিংস্র পশুগুলি বাস করে লেখক সকম্পিত হাতে তাদের ছদ্মবেশ টেনে খুলে দিয়েছেন। নির্মোহ নিরাসক্ত সমাজবিজ্ঞানীর মতো লেখক এখানে মধ্যবিত্ত সমাজের ভন্ডামি, প্রতারণা, ছলনা, ইতরতা, কদর্যতা, কুটিলতাকে উন্মোচিত ও বিশ্লেষণ করেছেন।

এ গল্পে পুরষতান্ত্রিক সমাজে আত্মসমপর্ণই যে নারীর একমাত্র নিয়তি নয়-পঙ্কে-নিমজ্জিত কলুষতাদীর্ণ দাম্পত্যের ব্যর্থতাকে আমৃত্যু বহন করে চলার পরিবর্তে এই সমাজেই নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্ববিকাশের পথও যে উন্মুক্ত সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ গল্পে মমতা তার নারীজীবন, মনুষ্যত্ব ও মাতৃত্বের অবমাননাকে ধর্ম ও সমাজসংস্কারের দোহাই দিয়ে মেনে নেয় নি। সংকীর্ণ সংসার সীমার বাইরে বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনকে অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে এ গল্পে তার নারী জীবন সার্থকতা খুঁজেছে। স্বদেশী ব্রতে নিয়োজিত নারী সমিতির কর্মতৎপরতায় সংলগ্ন থেকে বৃহৎ দেশকে সংসার কল্পনা করে সে তার অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনের প্রকৃত উপায় বের করেছে। স্বামী সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং নারীত্বের সার্থকতা ও আত্মসম্মানবোধ-এ দুয়ের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিত্বেরই জয় হয়েছে। এ গল্পের মূল বক্তব্য সম্পর্কে কৃষ্ণা বসুর মূল্যায়ন স্মরণীয়:

"এই পুরুষ প্রধান সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধে চালিত সমাজে নারীর জীবনের চরিতার্থতা যে তথাকথিত প্রেমে নয়, গার্হস্থ্য সীমানায় নয়, তার ও চরিতার্থতা যে বৃহৎ কর্মজগতের মুক্তিতে, কোন দু একটি ব্যক্তি বিশেষের কারণে যে তার মানবজীবন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না। এই জরুরী সত্যটুকুকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৃহত্তর ও মহত্তর' গল্পে উচ্চারণ করেছেন অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে"।[২৪]

[২৪] ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭

'বৃহত্তর মহত্তর' গল্পের নায়িকা মমতাদির মনে স্বামী নগেন সম্পর্কে দাম্পত্য প্রেম শিথিল হয়ে গেছে এবং সন্তান স্নেহও ক্রমম্রিয়মান, এর মূলে আছে পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধের গন্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর সামাজিক তথা মানবিক আদর্শচেতনা সম্পর্কে তার ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি ও বিশ্বাস। ঘর ছেড়ে মফঃস্বলে দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে মমতাদি। সে বলেছে 'অনেক দুঃখেই বাড়ি ছেড়েছি ভাই। আমি অভিশপ্ত স্ত্রী ও জননী, আমার সন্তান দেশের অভিশপ্ত জীবনের এমন অসামঞ্জস্য বরদাস্ত হলো না, আমি মুক্তি নিলাম"।

'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পটি প্রাক-মার্কসিস্ট পর্বে মধ্যবিত্তের আর্থিক সংকট নিয়ে রচিত এক অসামান্য গল্প। প্রথম গল্পসংকলন 'অতসীমামী'র অন্যান্য গল্প থেকে একেবারে আলাদা জাতের এক আশ্চর্য সার্থক গল্প এটি, কাহিনীতে তেমন কোন চমক বা নূতনত্ব নেই। নিদারুণ দারিদ্র্যের নির্মম প্রহারে জর্জরিত এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মর্মান্তিক দুর্গতি ও হতাশার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পটভূমিকায়। বস্তুত, এ গল্পের শ্রেষ্ঠত্ব এর কাহিনী পরিকল্পনায় বা পরিবেশ-বিন্যাসে নয়-এর অনন্যতা দুর্গত মধ্যবিত্ত মানুষের নিছক অস্তিত্বরক্ষার অসহায় মরীয়া প্রয়াস ও তার ব্যর্থতার বিরুদ্ধে নিস্ফল মুক্ত আক্রোশের রূপায়নে। সমগ্র কাহিনী ও আবহের ভিতর থেকে সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক চাপা ব্যঙ্গ-দৃষ্টির জ্বালা বিচ্ছুরিত হয়েছে যেন-তার সঙ্গে মিশে আছে।

বলা বাহুল্য, নিঃসম্বল ক্ষতবিক্ষত মানুষের নিরূপায় হাহাকার। আর এই মিশ্র মনোভঙ্গি, যা এই গল্পের শিল্প সাফল্যের মূলে তা ব্যঞ্জিত হয়েছে গল্পের শিরোনামে। 'আত্মহত্যার অধিকার' এই শিরোনামে আসলে মানব সমাজের কাছে গল্পের নায়ক নীলমনি তথা লেখকের এক মৌল মানবিক বিজ্ঞাসা :

'বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিস্প্রয়োজন, সকলে যেখানে বাঁচিতে চায, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?

এ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন দুর্বিষহ দুঃখযন্ত্র আর অন্তহীন ইতরতার মধ্যেও মানুষের আত্মহত্যার অধিকার নেই। আত্মখণ্ডন নয়, আত্মবিস্তার-ই জীবনের লক্ষ্য।

গরীব নীলমনি সপরিবারে বর্ষারাতে জেগে বসে আছে, কারণ ঘরের চাল পচে ফুটো হয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ছে। স্ত্রী নিভা কোলের ছেলেটাকে বুকে নিয়ে পায়চারি করে, ছেলে নিমু, মেয়ে শ্যাম এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে থাকে আর নীলমণি দুঃখ আর দারিদ্র-জ্বালায় জ্বলতে

থাকে, শেষ পর্যন্ত মাঝরাতে ভিজতে ভিজতে সরকারদের পাকা বাড়িতে গিয়ে ওঠে। বাইরের ঘরের মেঝেতে চট পেতে শোবার অনুমতি পেয়ে নীলমনি কৃতার্থ হয়ে যায়। এই অনুমতির পিছনে একদিকে ছিল কৃতার্থমন্যতা অপরপক্ষে বিরক্তি-মিশ্রিত দয়া।

লেখক ধাপে ধাপে নীলমনিকে নৈরাশ্য থেকে সংগ্রামের স্তরে তুলে এনেছেন। ঐ দুর্যোগের রাতে নীলমনি ভেবেছে সব অপরাধ তার। এখানে নৈরাশ্য ভেঙে পড়ার মনোবৃত্তি প্রকট। নিমু ঘরে কোণে ঘুমুচ্ছে দেখে নীলমনির মনে হয় ছেলেটা তাকে ব্যঙ্গ করছে। নিভা যখন সরকার বাবুদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে চায়, তখন নীলমনি অন্ধ রাগে তাকে খুন করতে চায়। জোর বৃষ্টি আসে, মান অপমান জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে সরকার বাবুদের বাড়িতে ভিজে ভিজে যেতেই হয় এবং গ্লানি মেখে বৈঠকখানায় আশ্রয় নিতে হয়। এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও নীলমনির মন খুশি হয়। 'সুখশয্যা না জুটুক, নিরাত, শুষ্ক, মনোরম আশ্রয় তো জুটিয়াছে'। তখন মেয়ে-বৌর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, সরকারদের আশ্রিত হাঁপানীর রোগী বুড়োকে সান্ত্বনা দেয়, আর বাকি তামাকটুকু নিভন্ত লণ্ঠনের আলোয় সেজে নেয়। "তারপর ঠেস দিয়া আরাম করিয়া পিসের শ্বাস টানার মতো খাঁ খাঁ করিয়া জলহীন হুঁকায় তামাক টানিতে লাগিল"। গল্প শেষ হয়েছে এই উপলব্ধিতে যে, বেঁচে থাকার লড়াই কোন দিন শেষ হয় না।

অন্ধ (প্রাগৈতিহাসিক) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সনাতনকে মানিক রূপায়িত করেছেন তার অপরাধবোধতাড়িত জীবনাচরণ, দুঃবিস্মৃতির উপায়স্বরূপ তার পানাভ্যাস এবং পরিণতিতে আসক্তি, অন্ধত্বলাভ ও পুরোপুরিভাবে স্বার্থপীড়িত জীবনবোধসমেত। দোতলা অট্টালিকা নির্মাণকালে অর্থাভাবে স্ত্রীর অলংকার বিক্রি করলে সেই শোকে চাকরিজীবী সনাতনের স্ত্রী সাত বছরের একমাত্র কন্যা ও স্বামীকে রেখে প্রথমে গৃহত্যাগ ও পরে মৃত্যুবরণ করে। স্ত্রীর প্রতি গভীর মমত্ব ও ভালবাসার ফলে সনাতনের মধ্যে, এই ঘটনায় কতগুলো মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। একদিকে সীমাহীন অনুশোচনা, অনুতাপ, পাপবোধ, অন্যদিকে কন্যার প্রতি স্নেহশূন্য বিরাগ, আত্মক্ষয়ী জীবনমমতা, একান্ত স্বার্থপুষ্ট অস্তিত্ব-রক্ষার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি অনুষঙ্গ তার পরবর্তী জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

স্ত্রীর গৃহপরিত্যাগ ও মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করার পর সনাতন যে আত্মপীড়ন ও গ্লানিজর্জরতার সম্মুখীন হয়, নিয়মিত অনুতাপের মধ্য দিয়েই তা থেকে সে মুক্তি খোঁজে। আর এই তীব্র অনুশোচনা জনিত হৃদয়দহন থেকে মুক্তিকল্পে সে নিমজ্জিত হয় নিয়মিত পানাভ্যাসে। সনাতনের এ সকল আচরণের মধ্য দিয়ে যে-প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ করি, ফ্রয়েডকথিত মৃত্যুপ্রবণতার মধ্যে তা সম্পর্কযুক্ত। এই জীবনবিরোধী প্রবৃত্তির ফলে একাকিত্বই হয়ে ওঠে সনাতনের একমাত্র আরাধ্য। যে-কারণে একমাত্র কন্যাকেও সে বিয়ে দিয়ে দ্রুত শ্বশুরালয়ে প্রেরণে উদ্যোগী হয়। কিন্তু কন্যার বিয়েতে সে কার্পণ্য করে। পরিণামে শ্বশুর গৃহে তার কন্যা নিপীড়নের সম্মুখীন হলেও সনাতন থাকে নির্বিকার। অতঃপর কন্যাজামাতার সংসার পরিবেষ্টিত অন্ধ জীবনে সনাতনের স্বার্থদুষ্ট আচরণের অস্বাভাবিকত্ব অব্যাহতই থাকে।

সনাতনের অসুস্থ রোগগ্রস্ত মনের সমীক্ষণসূত্রে মানিক সমাজজীবনের কিছু বাস্তবচিত্রও প্রসঙ্গক্রমে অঙ্কন করেছেন। মধ্যবিত্তমানসের স্বার্থান্ধ জীবনপরিবেশ মানবহৃদয়কে কিভাবে স্নেহশূন্য সহানুভূতিশূন্য নির্দয় ও বিবেকহীন করে তোলে-অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে মানিক তার মর্মোদ্‌ঘাটন করেছেন।

সরোজমোহন মিত্র বলেন 'আসলে সনাতন অন্ধ নয়, এ সংসারে সকলেই নিজের স্বার্থবোধের দ্বারা অন্ধ'।[২৫]

গোপিকানাথ রায় চৌধুরীঃ 'অন্ধ গল্পে মেয়ে ও জামাইয়ের সঙ্গে সনাতনের সম্পর্কের অসাঞ্জস্যের মনস্তাত্ত্বিক ছবির সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িয়ে আরেকটি সত্য, সেটি হলো মধ্যবিত্ত মানুষের মনে হৃদয়-সম্পর্ককে ছাড়িয়ে হীন অর্থলোভ ও স্বার্থবুদ্ধির প্রাধান্য।'[২৬]

একমাত্র সন্তান হয়েও মোহিনী বৃদ্ধ ও অন্ধ সনাতনের প্রতি যে রূঢ় আচরণ অন্যদিকে নববধূ হিসেবে মোহিনীর প্রতি শ্বশুরালয়ের যে লাঞ্ছনা এগুলি মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণিস্তরের মানুষগুলোর স্বার্থতাড়িত আচরণ সমূহকে মানিক এ গল্পে তুলে ধরেছেন।

[২৫] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬
[২৬] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭

'ফাঁসি' (প্রাগৈতিহাসিক) গল্পটি মধ্যবিত্ত জীবনের জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেখা। তবে এ গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের যে মনস্তত্ত্ব চোখে পড়ে তা যৌন মনস্তত্ত্ব নয়, সেসব বিভিন্ন ধরনের মানস-জটিলতার সঙ্গে গ্রন্থিজালে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা, গল্পে দেখা যায় হত্যার অভিযোগে স্বামীর মৃত্যুদন্ডাজ্ঞা ও তা থেকে মুক্তিলাভ প্রভৃতি ঘটনার সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও বহির্বিষয়ক চাপ একজন গৃহবধূর জন্য কী মনোবেদনার কারণ হতে পারে– তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে গনপতির কারাবাস, নিম্ন আদালত কর্তৃক ফাঁসির আদেশ এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক সেই দন্ড মওকুফের পর তার মুক্তিলাভ – এই সকল ঘটনায় তার স্ত্রী রমা বিস্ময়কর ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও সুস্থিরতার পরিচয় দিলেও কারামুক্তি শেষে স্বামীর গৃহপ্রত্যাবর্তনের পর তার সহনশীলতার প্রাচীর ভেঙে যায়। একটি দিনের জন্যও তার পক্ষে স্বামীসহ পরিচিত লোকালয়ে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর নিজ মনোবাসনার প্রতি স্বামীর অসমর্থন তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। ধর্মসংস্কারের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের স্বামীর প্রতি তার বিরাগ বা অশ্রদ্ধাকে সে অবজ্ঞা করতে পারে কিন্তু সামাজিক দুর্নাম, অপমান বা গৌরবহানিকে উপেক্ষা করতে পারে না, তবে তার স্বামীর যদি ফাঁসি হতো কিংবা আমৃত্যু তার স্বামী থাকত কারাগারে তাহলে ওই সামাজিক অসম্মানের মধ্যেও রচনা বেঁচে থাকতে পারত, স্বেচ্ছামৃত্যুর পথে যেত না। এখানে মানিক রমা-চরিত্রের মনোগত আচরণের নিগূঢ় রহস্য বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত স্বামীর অবর্তমানে তার অপবাদকে হয়ত সহ্য করা যায়, কিন্তু সেই মূর্তিমান কলঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে পরিচিত জগৎ- মধ্যে তার লজ্জা ও গ্লানির ভারবহন করা সম্ভবপর নয়। রমা চরিত্র সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন-

'গনপতি পুরুষ-চারদিকের সমস্ত সংশয়, বিষ আর বিদ্রুপের মধ্য দিয়েও আবার হয়তো সে সহজ জীবনে ফিরে যেতে পারবে, কিন্তু তার মনে যে জটিলতার গ্রন্থি পড়েছে তার

মোচন সে করবে কী উপায়ে? এই দৈনন্দিন আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে বাইরের জগৎ প্রতিদিন ইন্ধন দেবে-মনের দিক থেকে রমা কখনো স্বামীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে না – এই অসহ্য দ্বিমুখি পীড়নের হাত থেকে তার নিস্কৃতি নেই।'[২৭]

অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে রমা চরিত্রের অন্তপীড়নের পাশাপাশি একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের কোন সদস্য অকস্মাৎ মানবহত্যার মতো নিন্দনীয় ঘটনায় জড়িয়ে পড়লে ওই পরিবার ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে এর যে প্রতিক্রিয়া কিংবা সামাজিক আলোড়ন সংঘটিত হয, তার বিশদ বিবরণও দিয়েছেন।

[২৭] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬

টিকটিকি (মিহি ও মোটা কাহিনী) – টিকটিকি গল্পটিও মানিকের মধ্যবিত্ত জীবনের জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেখা গল্প। এ গল্পে মনোগহনের আঁধার পথে মানিকের স্বচ্ছন্দ চলাফেরার পরিচয় পাই। গল্পের কাহিনীতে দেখা যায় সকালে স্ত্রীর মুখ থেকে মৃত্যু প্রসঙ্গ উত্থাপনের সময় টিকটিকির সম্মতিসূচক ডাক এবং ওইদিনই সন্ধ্যায় তার মৃত্যুর ঘটনা জ্যোতিষার্নবের মনে টিকটিকি সংস্কার দৃঢ়মল করে দেয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রচর্চার মাধ্যমে মানুষের 'অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে', স্ত্রীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, সেই ব্যক্তি এ দিকে নিজের অজ্ঞতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে যেমন প্রকটভাবে প্রত্যক্ষ করে, অন্যদিকে তেমনি টিকটিকির অভ্রান্ত ডাকের সঙ্গে মৃত্যুর নিশ্চিত সংযোগ আবিষ্কার করে মনোমধ্যেকার আদিম সংস্কারে সে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মনোজগতে একটি ঘটনার এরূপ দ্বিবিধ অভিঘাতের ফলে জ্যোতিষার্ণবের মন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর নিজের সকল বক্তব্যের সত্যাসত্য নিরূপনের জন্য ত্রিকালদর্শী টিকটিকির আহবানের অপেক্ষা করা তার গভীরতর সংস্কার ও স্বভাবে পরিণত হয়। ব্যবসায়িক পরিবেশেও সে টিকটিকির অভ্রান্ত উচ্চারণের কথা প্রকাশ করে। ছ মাস পরে নতুন বিয়ে উপলক্ষে গৃহের টিকটিকি-নির্ধন, নববধূর মুখ থেকে মৃত্যু প্রসঙ্গ যাতে কখনও উচ্চারিত না-হয় সে-ব্যাপারে সতর্কতার, নববধূর কিশোরবন্ধু মানিককে দিয়ে গৃহের নতুন টিকটিকিগুলোর হত্যা সাধন প্রভৃতি জ্যোতিষার্ণবের ব্যাধিগ্রস্থ মনেরই বহিঃপ্রকাশ।

'বিপত্নীক' (মিহি ও মোটা কাহিনী) গল্পে সন্দেহ বাতিক কেরানী স্বামীর বশে স্ত্রীকে দুর্বিষহ অপমানে জর্জরিত করার ফলে স্ত্রী সবিতা আত্মহত্যা করেছে। কড়িকাঠের দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহননের এই ঘঠনায় স্বামীর আদৌ কোন অনুতাপ হয়নি। দাম্পত্য সম্পর্কের প্রত্যাশিত হৃদয়াবেগের দিকটিকে আচ্ছন্ন করে তার মনে জেগে উঠেছে স্ত্রী সবিতার আত্মহত্যা সম্পর্কে এমন এক আকস্মিক উদ্ভট প্রশ্ন "দড়িটা হুকে সে লাগাল কি করে?" যার মধ্য দিয়ে কেবল মানব মনের কুটিল গতিভঙ্গির তির্যক ইঙ্গিত মেলে না, সেই সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের নিহিত অন্তঃসারশূন্য ভন্ডামি এবং স্ত্রীর প্রতি গল্পের কথক-স্বামীর হীন আত্মকেন্দ্রিক হৃদয়হীনতা

সম্পর্কে লেখকের সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মনোভাবও গোপন থাকে না। দাম্পত্য জীবনের গৌরব-মহিমার আড়ালে লেখক কেবল যৌন চেতনাসম্ভব জটিল মানসিকতাই আবিষ্কার করেননি, এর মধ্যে আর্থনীতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের ব্যাধিজর্জর রূপটিকেও অভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন। সর্বোপরি এ গল্পে মানিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও মধ্যবিত্ত জীবনের ভন্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখিয়েছেন।

'শৈলেজ শিলা' (মিহি ও মোটা কাহিনী) – প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়কে বিজ্ঞানমনস্ক নিরাবেগ বাস্তব দৃষ্টির দর্পণে প্রতিফলিত করার নিপুণ সাক্ষ্য বহন করে শৈলজ শিলা গল্প। দাম্পত্য জীবনে বাইরে মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্বের কুটিল অন্ধকার রূপ আশ্চর্য তীক্ষ্মতায় আত্মপ্রকাশ করে এই সমাজের নগ্ন রূপকেই যেন অনাবৃত করতে চেয়েছে।

গল্পের কাহিনীতে দেখা যায় পিতার অত্যাচার-বৃত্তির পরিণতিতে অর্থাৎ নিজ বালবিধবা কন্যার গর্ভে ভ্রুণস্থাপনের ফলে-গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র শিলার জন্ম। এই অকথ্য অশ্রাব্য কাহিনীর যিনি একমাত্র সাক্ষী তিনি জন্মকাল থেকে শিলার প্রতিপালক, এ গল্পের উত্তমপুরষ। শিলার সঙ্গে রক্ত সম্পর্কহীন এইব্যক্তি–ঘটনা পরম্পরায় একান্ত বাধ্য হয়েই শিলাকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নিলেও ধীরে ধীরে তার মধ্যে রূপজমোহ ও লালসার এক বিষবৃক্ষ পত্রপল্লবিত হয়। শিলার বয়স পঞ্চদশবর্ষপূর্ণ হলে তার 'টানা চোখ আর রাঙা ঠোঁট আর অপূর্ব গঠনতনু' প্রতিপালকের মনোমধ্যে সুপ্ত ভোগবাসনার অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে। বিবাহের মাধ্যমে অন্য কোন যুবকের নিকট হস্তান্তরের পরিবর্তে ত্রিশবছর বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও এই প্রৌঢ় কুমার নিজেই শিলাকে ভোগ করার ব্যর্থ প্রয়াসে নিয়োজিত হয়।

অর্থাৎ মানুষের অদম্য কাম-প্রবৃত্তিকে আশ্চর্য সংযত অথচ যথাযথ বাস্তবতায় চিত্রিত করেছে গল্পকার-'শৈলজ শিলা'য়। অবৈধ পরিত্যক্ত যে শিশুটিকে কন্যাস্নেহে লালন করলেন এই গল্পের কথক। উত্তরকালে তারই যৌবনদীপ্ত রূপের মোহে উন্মত্ত হলেন তিনি। সেই অবিবাহিত অতৃপ্ত প্রায়-প্রৌঢ় মানুষটির জীবনে "পনের বছর পরে ভূমিকম্প। বাৎসল্যের সিমেন্ট দিয়া যৌবনের শক্ত গারদ করিয়াছিল তাহা ফাটিয়া একেবারে চৌচির।" প্রবৃত্তি-তাড়িত মানুষটির উত্তম-পুরুষের জবানীতে কাহিনীটি বিবৃত হবার ফলে দেহ-কামনার স্থূল চিত্ররূপের বদলে কথকের অতৃপ্ত কামনাজনিত নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা তথা আত্মবিশ্লেষণের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'সিঁড়ি' (মিহি ও মোটাকাহিনী) গল্পে মানিক মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, হিংস্রতা ও পাশবতার নগ্ন রূপ উদঘাটিত করেছেন। এ গল্পে দেখা যায় ভদ্র মধ্যবিত্ত মানব চরিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের ভন্ডামি, প্রতারণা, ছলনা, ইতরতা, কদর্যতা ও কুটিলতাকে উন্মোচিত ও বিশ্লেষণ করেছেন। গরীব ঘরের অবিবাহিতা খোঁড়ামেয়ে ইতির প্রতি বাড়িওয়ালা মানবের আত্মবঞ্চনা ও ভন্ডামির রূপ প্রকাশ পেয়েছে। চল্লিশ বছরের অবিবাহিত বাড়িওয়ালা মানবের নিকট আত্মনিবেদন ও প্রণয়াভিনয়ের মধ্য দিয়ে চার-পাঁচ মাসের বাকি ভাড়ার বিব্রতকর অবস্থাকে কাটিয়ে তার কাছ থেকে ঋণের নামে আরও অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করে ভাড়াটে কন্যা ইতি, আর এই সুযোগে মানব তার লালসা চরিতার্থ করার এক সুচতুর আবেগহীন পরিকল্পনা করে।

তাই সিঁড়ি গল্পে একদিকে ধনীর অর্থনির্ভর স্বার্থকেন্দ্রিকতা-জনিত-নৈতিক অবক্ষয় অন্যদিকে দারিদ্র্যের চাপে নিম্ন মধ্যবিত্তের 'আত্মবিক্রয়' তথা নৈতিক অধোগতির ইঙ্গিত দিয়ে লেখক মুখ্যচরিত্র দুটির মানব ও ইতি'র সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার প্রতীকী চিত্র ব্যবহার করেছেন। আর্থ-সামাজিক সমস্যাটি 'মার্ক্সিস্ট' পর্বের মতো এ গল্পে ফুটে উঠেছে প্রতীকী চিত্রকল্পে।

গোপিকানাথ রায় চৌধুরীর বক্তব্য অনুধাবনীয়ঃ

'সিঁড়ি' গল্পে গরীব ঘরের অবিবাহিতা খোঁড়া মেয়ে ইতিকে বাড়ীওয়ালা মানবের স্নায়ুতে যৌন অনুভূতি সঞ্চার করে চলতে হয় দিনের পর দিন, তার কোন পরিণাম নেই, কোন লক্ষ্য নেই, তার উদ্দেশ্য কেবল বিনা ভাড়ায় বাস করার সুযোগ লাভ এবং মাঝে মাঝে ঋণের ভদ্র আবরণ দিয়ে মানবের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের, বিশেষভাবে নারী জীবনের এই নিরূপায় অবস্থার দুঃসহতা লেখক সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত ওঠানামা এবং গুমোট গরমের সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনায় মূর্ত করে তুলেছেন।[২৮]

[২৮] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৯-১৪০

'প্যাঁক' গলে মানিক মধ্যবিত্ত জীবনে ভদ্রলোকি আবরণের যে অন্তঃসারশূন্যতা তা উন্মোচন করেছেন। মানুষের জীবনবোধ ও জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক শক্তির ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ, অথচ ওই শক্তির স্বল্পতা নিয়েও মধ্যবিত্ত জীবন এক প্রকার কৃত্রিম বেমানান আত্মম্ভরিতার আচ্ছাদনে নিজেকে আবৃত রাখতে পছন্দ করে। এর কারণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সহযোগীরূপে এদেশে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কেরানীকুল গড়ে উঠেছে, তার জন্মসূত্রেই রয়ে গেছে এই সীমাবদ্ধতা ও কৃত্রিমতার বীজ। আর মানিক যে মধ্যবিত্ত সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তা পুরোপুরিভাবে ক্ষয়িষ্ণু, ভঙ্গুর ও শ্রীহীন। বহির্গাত্রের চাকচিক্যরক্ষায় ব্যর্থপ্রয়াসী এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে মানিক তাঁর রচনায় সর্বদা আঘাত করেছেন।

এ গল্পে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক জীবনকে একই অট্টালিকার উপর ও নিচতলার বাসিন্দা হিসেবে উপস্থাপিত করে মানিক এদের ব্যবধানকে রূপকায়িত করে তুলেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুশান্ত, কেরানী-মধ্যবিত্তের সন্তান, সৃষ্টিশীলতায় সময় অপচয়কারী-এক বেকার যুবক। সুশান্তর পিতা অনাথ বন্ধুর আয় এত অল্প যে তিনজনের সংসারে পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহই কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এদেরই নিচতলার অধিবাসী ট্যাক্সি ড্রাইভার শিবচরণের সংসার, আয়তনে বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও, অধিকতর স্বচ্ছল। দুটি পরিবারের আর্থিক ক্ষমতার ভিন্নতা অথচ বিপরীত মানসিক অবস্থান-এ উভয়কে মানিক এ গল্পে রূপায়িত করেছেন। আর্থিক অক্ষমতা হওয়া সত্ত্বেও শ্রমজীবী স্তরের প্রতি অনাথবন্ধুর অবজ্ঞার সমান্তরালে শিবচরণের হীনমন্যতা ও ভদ্রজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। উপার্জনক্ষম হওয়ার লক্ষ্যে বেকারপুত্রের ড্রাইভিং শিক্ষার বাসনা প্রসঙ্গে অনাথবন্ধুর যে-প্রতিক্রিয়া, তাতেই তার আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত মানস সুস্পষ্টতা অর্জন করে। যেমন, '..... ভদ্রলোকের ছেলে অর্থোপার্জন করিয়া মোটর হাঁকায়, মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জন করে না। কষ্ট করিয়া মোটর ড্রাইভিং শিখিবার কি দরকার, রিকশা টানুক না সুশান্ত? একই কথা, তাতেও পয়সা আসিবে। অমন পয়সা রোজগারের মুখে আগুন'। অন্যদিকে বেকার ভদ্রলোক যুবক সুশান্তর

নিকট বোন মালতীকে বিয়ে দেয়ার জন্যে লালায়িত শিবচরণ নিজ শ্রেণিস্তর সম্পর্কে অপকর্ষবোধের কারণেই সুশান্তর ড্রাইভিং শিক্ষার আগ্রহকে সমর্থন করতে পারে না। শিবচরণের উক্তি-

'আমি ভাবলাম সখ করে শিখতে চান, নইলে গাড়ী চালান শিখে আপনার দরকারটা কি দাদা, এ্যাঁ? একি ভদ্দরলোকের কাজ.....।' শিবচরণের উচ্চারণ ও ভাবনার মধ্যেই গভীরভাবে নিহিত রয়েছে ভদ্রতার মুখোশ পরিহিত মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি মোহযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টির অভিব্যক্তি।

মানিক তার জীবনদর্শনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রান্তকেই এ গল্পে রূপদান করেছেন। মধ্যবিত্তের ভাবালুতা, ভদ্রলোকসুলভ আত্মম্ভরিতা, অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে বেমানান আত্মমর্যাদাবোধ প্রভৃতির প্রতি মানিকের ছিল সুস্পষ্ট বিদ্বেষ, অপক্ষপাত এবং ঘৃণা।

সরীসৃপ (সরীসৃপ) গল্পে দাম্পত্য জীবনের বাইরে মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্বের কুটিল অন্ধকার রূপ আশ্চর্য তীক্ষ্ণতায় আত্মপ্রকাশ করে এই সমাজের নগ্ন রূপকেই যেন অনাবৃত করা হয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, ক্রুরতা, হিংস্রতা ও পাশবতার নগ্ন রূপ উদঘাটিত করেছেন। ভদ্র মধ্যবিত্ত পোষাকের আড়ালে যে হিংস্র পশুগুলি বাস করে তারই ছদ্মবেশ টেনে খুলেছেন।

'সরীসৃপ' গল্পের নারী-পুরুষের সম্পর্ক সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমনিতেই বিচিত্র-পিঙ্গল অস্বাভাবী-আলোকসম্পাতে প্রচল মূল্যবোধে অভ্যস্ত পাঠক কে যেন বিমূঢ় করে তোলে। 'সরীসৃপ' গল্পে সেই অস্বভাবী জৈবকামনার সঙ্গে হীনতম আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থবুদ্ধির সংযোগের মর্মচ্ছেদী বিশ্লেষণ থেকে যেন মনে হয়, মধ্যবিত্ত মানুষের উপর লেখকের সামান্যতম আস্থাও আর অবশিষ্ট নেই। গল্পের একেবারে উপসংহারে মানুষ সম্পর্কে সেই 'সিনিক' দৃষ্টির কঠিনতম ব্যঞ্জনা সংবেদী পাঠকের চিত্তকে যেন স্তম্ভিত অসাড় করে দেয়। স্বার্থসর্বস্ব নিষ্ঠুর ধনী বনমালীকে আয়ত্ত করার দুর্মর বিকৃত কামনায় প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল প্রতিযোগী দুই সহদোরা-চারু ও পরী। দুজনেই বিধবা। যৌন মনস্তত্ত্বের সঙ্গে অর্থনেতিক সংকটের মিশ্রণে জটিল হয়ে উঠেছে গল্পটি। অতীতে চারুর শ্বশুর ছিলেন সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মালিক, আর বনমালী ছিল তাঁরই এক মোসাহেবের পুত্র। কিন্তু চারুর শ্বশুর ও স্বামীর মৃত্যুর পর সেই বিপুল সম্পত্তি "দেনার দায়ে....চারুর হাত হইতে খসিয়া বনমালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে"। অন্যদিকে চারুর বোন বিধবা পরীও নিঃসম্বল হয়ে নিজের সুখ ও সন্তানের ভবিষ্যতের দুরাশায় আত্মবিক্রয় করতে চেয়েছে বনমালীর কাছে কিন্তু বনমালীর সরীসৃপকল্প প্রায়-নিঃশব্দ অথচ ক্রুর তির্যক মানবগতির দুর্মোচ্য জটিল পাকে জড়িয়ে সর্বনাশের অতল অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে দুটি নারীই।

আমরা বলতে পারি যে পটভূমিতে গল্পের মানুষগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে, তাতে তাদের আচরণসমূহ অসংগত বা কার্যকারণ বিযুক্ত হয়েছে কিনা। গোপাল হালদার নিজেই

স্বীকার করেছেন, তা হয় নি এবং তিনি যথার্থভাবেই বলেছেন 'মানবতাও মিথ্যা নয়.....ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ক্ষয়ও একমাত্র সত্য নয়।" আর এ কারণেই "মধ্যবিত্ত মানুষের উপর লেখকের সামান্যতম আস্থাও আর অবশিষ্ট নেই"।

অধিকাংশ সমালোচক 'সরীসৃপ' গল্পে বিধৃত মানবমনের কুৎসিত কদাকার রূপ উন্মোচনের বিষয়টিকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন। বিবেচনার জন্য সমালোচকবৃন্দের কিছু বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য :

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : "সরীসৃপ গল্পটিতে ভদ্র পরিবারের বৈষয়িক সুবিধার জন্য দেহলালসা উদ্রেকের কুৎসিত ও গ্লানিকর প্রচেষ্টার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ মিলে"।[২৯]

নারায়ণ গঙ্গোপাধায় : "বনমালীকে আয়ত্ত করবার জন্য দুই বিধবা বোন চারু এবং পরীর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে– সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তার কদর্য কুটিলতার দ্বিতীয় নিদর্শন আছে কিনা সন্দেহ। সরীসৃপ যেন নরকের কাহিনী"।[৩০]

রথীন্দ্রনাথ রায় : "সভ্যতার বাইরের খোলস যত বর্নোজ্জ্বলই হোক না কেন, তার ভিতরের রূপ কত বিকৃত ও অসুস্থ, তিনি তা নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।"[৩১]

সরোজমোহন মিত্র : "আমাদের সমাজ ও সভ্যতার কৃত্রিম অন্তরালে কত বিষাক্ত কুটিলতা সরীসৃপের মত বিরাজমান এ গল্পে তা দেখান হয়েছে"।[৩২]

[২৯] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৬
[৩০] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৬
[৩১] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৬
[৩২] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৬

"সমুদ্রের স্বাদ" (সমুদ্রের স্বাদ) গল্পটিতে মধ্যবিত্ত মনের জটিলতা আর সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের কিশোরী নীলার বড় সাধ ছিল পুরী যাবে, সমুদ্র দেখবে কিন্তু অর্থের অভাবে শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হল কই? সে শুনেছে নীল সমুদ্রের জল লবণাক্ত। তার স্বাদ পেল কই? যেতে না পেয়ে মন খারাপ নীলার একদিন "আঙুল কাটিয়া গিয়া টপটপ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে আর চোখ দিয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়েছে জল, মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীল জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে"। লবণাক্ত সমুদ্রের স্বাদ বুঝি নীল লবণাক্ত অশ্রুতে মেটায়।

মধ্যবিত্ত মানুষের অপূর্ণ স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে প্রতীকায়িত করেছেন লেখক। দরিদ্র মধ্যবিত্ত জীবনে বাস্তবতা ও স্বপ্নের যে দ্বন্দ্ব এবং অনিবার্যভাবে সেই দ্বন্দ্বের যে ব্যর্থ পরিণতি, সর্বোপরি এক আশাহীন পরিবেশের যে নিরবচ্ছিন্নতা–এই সবই এ গল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া ভাবালু, অনুভূতিপ্রবণ, অতিমাত্রায় সংবেদনশীল মধ্যবিত্তের হৃদয় যে এসবের পরিণতিতে বিকারগ্রস্ত হয়ে ওঠে-সেসবের ছবিও লেখক এ গল্পে অতিশয় কুশলতার সঙ্গে অঙ্কজন করেছেন। সামগ্রিক ভাবে 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পে সমাজ জীবনের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে মধ্যবিত্ত-মানসের বিচিত্র অসংগতি ও অসংলগ্নতা উন্মোচনের কথা স্বীকার করা হয়েছে। মানিক বলেছেন :

'ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে 'সমুদ্র স্বাদে'র গল্পগুলি লেখা। প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মরমর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ক্ষতে

ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত-মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙ্গে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে।'[৩৩]

তবে ভ্রান্তি উন্মোচনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর নির্দয়তাই মানিক দেখাননি এক প্রকার গভীর মমত্ববোধও তার মনে সক্রিয় ছিল। আর সে-কারণেই তাঁর এ-বক্তব্যের শেষ অংশটি এইরূপ "দরদ দিয়ে নির্মম আত্মসমালোচনার মূলে আমি আজও বিশ্বাসী।"

অর্থনেতিক দৈন্য মধ্যবিত্ত জীবন স্তরের জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বপ্ন-আশাগুলিও যখন দারিদ্র্যের কারণে প্রতিমুহূর্তে দলিত পিষ্ট ও চূর্ণবিচূর্ণ হতে থাকে, তখন তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত হৃদয় হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক, অপ্রতিভ, সংকুচিত ও আশাহীন বেদনায় পান্ডুর। এ গল্পের নীলা চরিত্রের সমুদ্রদর্শনের সাধটি এমন কোনো অসম্ভব-কল্পনা নয়, তবু তা শেষ পর্যন্ত যে অপূর্ণ থেকে যায়-তাতেই ওই নারীর এবং সেই সূত্রে তার মধ্যবিত্তজীবনের অন্তর্নিহিত বেদনা ও যন্ত্রণার স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নীলা চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার শ্রেণিবৈশিষ্ট্যের দীর্ঘশ্বাস, অপরিসীম দুঃখকাতরতার সমষ্টি।

শৈশবে পিতার মুখে গল্পাকারে এবং পরবর্তীকালে পাঠ্যগ্রন্থের মুদ্রিত অক্ষরের মাধ্যমে নীলা জানতে পারে, এ পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ অঞ্চল জুড়েই সমুদ্র-শুধু জল আর জল অথচ তার পরিচিত যে পৃথিবী, মামা বাড়ি যেতে সকাল-সন্ধ্যা রেলভ্রমণের সময় দেখা তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে-জগৎ, সেখানে চারিদিকে মাঠ, মাঝে মাঝে জঙ্গল, আকাশ পর্যন্ত শুধু মাটি আর গাছপালা। এভাবেই অল্প বয়সে নীলার মনে বাস্তব ও কল্পনার দ্বন্দ্ব এবং তৎসূত্রে সমুদ্রদর্শনের কৌতূহল আগ্রহ ও স্বপ্ন সুগঠিত হয়। কিন্তু পিতার স্বল্প বেতনের চাকরি, অতঃপর পিতার আকস্মিক মৃত্যু, সে কারণে মাতুলালয়ে আশ্রয় লাভ ও সবশেষে বিবাহজনিত বিশেষ পরিস্থিতি–

[৩৩] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৩

এই সবকিছুর প্রতিকূলতায় সমুদ্র দেখার সাধ আর পূর্ণ হওয়ার সুযোগ পায় না। নীলার কেরানি-পিতার স্বল্প আয়ই কন্যাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভাঙতে তাকে বারবার বাধ্য করে। স্ত্রীর দীর্ঘদিনের সাধ পূরণার্থে সমুদ্র তীরবর্তী তীর্থস্থান একবার শুধু গমন, নীলার পিতার পক্ষে, সম্ভব হলেও আর্থিক অনটনের কারণে সন্তানদের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যায়। অতঃপর ঋণ করে হলেও নীলাকে পরবর্তী পূজায় সমুদ্র দেখানো হবে–তার এই সর্বশেষ প্রতিশ্রুতিও থেকে যায় অপালিত। কেননা মৃত্যু এসে সেখানে বাদ সাধ। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ে'র 'কেউ কথা রাখেনি শীর্ষক বিখ্যাত সেই কবিতার কয়েকটি পংক্তি–যেখানে মধ্যবিত্ত জীবনের নানারূপ বিড়ম্বনা ও পদে পদে তাদের আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যুর কথা উপস্থাপিত হয়েছে অতিশয় করুণ ব্যঞ্জনার সঙ্গে। যেমন–

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাম-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণকঙ্কনপর ফর্সা রমণীরা
কত রকম আনন্দে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি!
বাবার আমার কাঁধ ছুয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও.....
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাম-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না!

এ-জীবনের এটাই যেন নিয়ম, এই দীর্ঘশ্বাসই যেন এ-জীবনের নিয়তি-কিছুই দেখা হয় না, কোনো স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয় না–সব প্রতিশ্রুতিই শেষ পর্যন্ত থেকে যায় অসাধ্য,

অরক্ষিত, জীবনের এই ঘোরতর দুঃখময়তা, এই আনন্দহীন পরিবেশ মানুষকে নতুন করে কোন আশায় বুক বাধতে আর শক্তি জোগায় না, মধ্যবিত্তের এই নিরুৎসব নিরুদ্যম জীবনের ভবিষ্যৎ তাই সর্বদা থাকে অনুজ্জ্বল, অন্ধকারেই আচ্ছন্ন, স্বামী সংক্রান্ত চিন্তার মধ্যেও নীলার মর্মযাতনার স্বরূপটিকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি। 'সজ্ঞানে মনের মত স্বামীলাভের তপস্যা সে কোনদিন করে নাই, কি রকম স্বামী পাইলে সে সুখী হইবে, কোনদিন এ কল্পনা তার মনে আসে নাই, সুতরাং আশাভঙ্গের বেদনা তার নাই, আশাই তো সে করে নাই, তার আবার আশাভঙ্গ কিসের?"

মানুষের আশাভঙ্গের বেদনার মধ্যেও কিছু আশা কিছু সান্ত্বনা হয়ত অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু বাস্তবের নির্মম কষাঘাতে স্বপ্ন দেখার সামর্থ্যই যে হারিয়েছে তার যন্ত্রণা আরও মারাত্মক, আরও ভয়াবহ, তার ভবিষ্যৎ শুধু শূণ্যতায় ধূসর ও পান্ডুর। নীলার উপর্যুক্ত মনোভাবনায় মধ্যবিত্ত সংসারের চরম অভাবগ্রস্ত আকাঙ্ক্ষা ভীরু রূপটিই দৃশ্যময় হয়ে ওঠে।

নীলা চরিত্রের অর্ন্তসংকট উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে মানিক মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণার স্বরূপ বিশ্লেষণের যে-প্রয়াস পেয়েছেন, তার সফলতাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসেবে একটি নারী-চরিত্রকে নির্বাচন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই সাফল্যের প্রাথমিক বীজ। কেননা বাঙালী সংসারে যুবতী নারীর অবস্থান যেমন সুদৃঢ়, তেমনি নয় স্বাধীন ও সার্বভৌম। মধ্যবিত্ত জীবনের যে বঞ্চনা অবহেলা বা বিড়ম্বনা, আর্থিক দৈন্যের জন্য পদে পদে যে-অসম্মান বা লাঞ্ছনা, তা একই জীবনস্তরের পুরুষ অপেক্ষা নারীর ক্ষেত্রে অনেক বেশি সত্য। তাই তরুণী নীলা চরিত্রের জীবনকাঠামোর অভ্যন্তরে তার শ্রেণিস্তরের দুঃখকাতর বৈশিষ্ট্যসফল রূপময় করে তোলার ফলে তা হয়ে উঠেছে আরও তীব্র মর্মগ্রাহী ও আবেদনবাহী। নীলা চরিত্র যেমন মধ্যবিত্ত জীবনস্তরের সার্থক প্রতিনিধি তেমনি সমুদ্র এ গল্পে মুক্তি প্রেরণার প্রতীক। সমুদ্রের মধ্যে যে বিশালতা-গভীরতা ও অসীমের ব্যাঞ্জনা তা এই

গন্ডিবদ্ধ এবং শত বন্ধনজালে আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত জীবনের সমান্তরালে উপস্থাপিত হওয়ায় এই শেষোক্ত জীবনের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ রূপটি আরও দৃঢ়ভাবে আভাসিত হতে পেরেছে।

সমালোচেকরা এ গল্প বিশ্লেষণে মধ্যবিত্তের জীবনজ্বালা এবং এই যন্ত্রণার প্রতীকায়নে নীলা-চরিত্রের সার্থকতা উপস্থাপনের কথা স্বীকার করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'সমুদ্রের স্বাদে' নীলার সমুদ্রস্বপ্ন রূপকের আকারে দেখা দিয়েছে। মধ্যবিত্ত সংসারে নীলার মত অনেক মেয়েই সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে–যে সমুদ্র মুক্তি বা মহাজীবন, খাঁচার পাখি নীল আকাশে যে মুক্তির স্বপ্ন দেখে,- কিন্তু অনিবার্যভাবেই সেই সমুদ্র জীবনের বর্ণবৈচিত্র্যহীন, সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ গন্ডির হতাশা ও বেদনায় পরিণাম লাভ করে–নীলার মত অনেক কিশোরীর স্বপ্ন ও সমাপ্তির কাহিনী 'সমুদ্রের স্বাদ'। গল্পটির রূপক-ব্যঞ্জনায় কবিচিত্তের স্পর্শ আছে।[৩৪]

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : ..... এক আশ্চর্য শিল্প সফল গল্প 'সমুদ্রের স্বাদ'। মধ্যবিত্ত ঘরের অতিসাধারণ মেয়ে নীলর মনে সমুদ্র দেখার আকাঙ্ক্ষা, তার কাছে যা এক রোমান্টিক পিপাসার মতো তা কোনদিনই বাস্তবে চরিতার্থতা পায় না। এই আকাঙ্ক্ষার আর্তি এবং তার অপূর্ণতার বেদনায় নীলার মানসজগৎ যেমন পাঠকের সামনে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে– অন্য দিক, এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার অন্তরালের কঠিন অর্থনৈতিক প্রশ্নটিকেও পাঠকের সামনে উদ্যত করে তুলতে ভোলেননি সমাজ-বিজ্ঞানমনস্ক লেখক। গল্পের একেবারে শেষে নীলার চোখের জলের নোনতা স্বাদের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের স্বাদ পাওয়ার করুণ মর্মস্পর্শী ব্যঙ্গচেতনার এক অপরূপ সংগতি দান করেছেন।"[৩৫]

সমালোচকগণ যথার্থভাবেই এ গল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন মধ্যবিত্ত নারীর মুক্তির স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, দুঃখী মানুষের জীবনে বিড়ম্বনার বৃহত্তর ব্যঞ্জনা, গৃহবদ্ধ নারী জীবনে অধিকাংশ সাধেরই অপূর্ণতার সাংকেতিকতা, করুণ রস, রোম্যান্টিক পিপাসার আর্তি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসমূহ।

---

[৩৪] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৬
[৩৫] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৬

ভিক্ষুক (সমুদ্রের স্বাদ) গল্পে একটি শ্রমঘনিষ্ঠ সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণির কোনো ব্যক্তি ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে হীন মানসিকতায় প্রলুব্ধ হয়ে কিভাবে ধীরে ধীরে জীবিকা-নির্বাহের সহজ অথচ লজ্জাকর পথ অবলম্বন করে–তারই আলেখ্য হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজেরই একটি অংশের মানুষের বিশেষ মনোবৈশিষ্ট্যের ও প্রকাশ ঘটেছে সুস্পষ্টভাবে। আর তা হলো শ্রমবিমুখতা বা শ্রমভীরুতা এবং এরই অনুষঙ্গ হিসেবে আত্মসম্মান বিসর্জনে আগ্রহ। মানুষ হিসেবে নিজজীবনের যে গৌরব বা মহত্ত্ব– সেই উপলব্ধিকেই ব্যক্তিকে সমাজে সর্বদা একটি সম্মানজনক অবস্থায় জীবননির্বাহে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য সে প্রচুর কষ্ট স্বীকারেও কাপর্ণ্য করে না। আর এই উপলব্ধির অভাবেই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে উদাসীনতা জন্মে। ব্যক্তি মানসের ক্ষেত্রে এই ঔদাসীন্যের কারণ অনুসন্ধান করলে আমাদের দৃষ্টিসীমায় অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে দারিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসসহ এ সমাজের সর্বগ্রাসী পশ্চাৎপদতার বিষয়টি।

এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র যাদব বেকার জীবনের গ্লানিসহ বহুবছর শ্বশুরের অন্ন ধ্বংসের পর কলকাতায় গিয়ে এমন একটি কষ্টকর চাকরির সন্ধান পায়, যার আয় নিজসংসারের ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে খুবই অপর্যাপ্ত। তবু প্রায় এক বছর চাকরির পর হাতে কিছু অর্থ জমা হলে-স্ত্রী-সন্তানদের সে কলকাতায় তার কার্যস্থলে নিয়ে যাওয়াই স্থির করে। এ উদ্দেশ্যে দুদিনের ছুটি নিয়ে শ্বশুরালয়ে গমনের সময়ই তার জীবনে ঘটে নীতিবোধ বিসর্জনে সহায়ক একটি দুর্ঘটনা। শ্বশুরগৃহ থেকে ছ-সাত মাইল ব্যবধানে অবস্থিত নিকটবর্তী রেলষ্টেশনে যখন সে নামে তখন রাত মাত্র আটটা হলেও গ্রামীণ পরিবেশে নির্জনতায় তা গভীর। ফলে ষ্টেশন থেকে শ্বশুরালয় পর্যন্ত দীর্ঘ নির্জন গ্রামপথ গভীর অন্ধকারের মধ্যে অতিক্রম করা যাদবের জন্য, বিশেষত একবছরের শহরবাসের পর, হয়ে ওঠে কষ্টসাধ্য। নিজের সঙ্গে অতগুলি টাকা থাকার জন্য প্রথমে সে দ্বিধান্বিত হয়, কিন্তু ছুটির স্বল্পতা বিবেচনা করে একান্ত বাধ্য হয়ে পথে নামে। অতঃপর অন্ধকার, নিস্তব্ধ, জনহীন পথে নানা প্রকার ভয় তাকে তাড়না করে। এ সময়ে

একজন সঙ্গীর সাক্ষাৎ ঘটলে তার পক্ষে আতঙ্ক অতিক্রম করা সম্ভবপর হলেও অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি স্বাভাবিক সন্দেহবশত, নিজের সঙ্গে নেয়া অর্থের কথা ভেবে, যাদব মিথ্যার আশ্রয় নেয়। নিজের বেকারত্ব, পুত্রের অসুস্থতা, অর্থের অভাবে টিকেটহীন রেল ভ্রমণ প্রভৃতি মিথ্যাচারের ফলে আবার সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির। অপরিচিত লোকটি দয়াপরবশ হয়ে দশ টাকার সাহায্য প্রদান করলে যাদবের চিন্তারাজ্যে তা গভীর পরিবর্তনের সুচান করে। যাদবের মনে প্রশ্ন জাগেঃ নিজের দুর্দশার কথা বলে ভদ্রলোকের মনে সহানুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে এমন সহজ উপায়ে যদি অর্থ উপার্জন করা সম্ভবপর, তাহলে সে উদায়স্ত এমন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছে কেন? অতঃপর স্ত্রী সন্তাসহ কলকাতায় গিয়ে প্রচন্ড পরিশ্রম সত্ত্বেও সংসারের অসহনীয় অসচ্ছলতার মধ্যে ওই চিন্তাই তার মনে বারবার ঘুরপাক খায়। অবশেষে একদিন পুত্রের অসুস্থতা সংক্রান্ত মিথ্যা ভাষণসহ নিজের দুর্দশার কাহিনী শুনিয়ে ভদ্রলোকদের মনে সহানুভূতি জাগ্রত করার কাজে সত্যি সত্যি সে অবতীর্ণ হয়। প্রথমজন তাকে অগ্রাহ্য কর, দ্বিতীয়জন তাকে ঠিকই অর্থ সাহায্য করে। এভাবেই ভিক্ষাবৃত্তিতে যাদবের হাতেখড়ি ঘটে। প্রথমে মানসিক দ্বিধা, লজ্জা জাগলেও পরবর্তিতে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ভদ্রলোকদের মনে মমত্ববোধ সৃষ্টির ললক্ষ্যে অতঃপর, 'চুলে সে তেল দেয় না, আঁচড়ায়ও না। কাজ হইতে বাড়ি ফিরিয়াই ছেঁড়া কাপড়-জামা পরিয়া ছেঁড়া একটি জুতা পায়ে দিয়া আবার বাহির হইয়া যায়। আজ শহরের এ-অঞ্চলে, কাল শহরের ও-অঞ্চলে বাছা বাছা মানুষকে নিজের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী শুনাইবার চেষ্টা করে"।

ব্যক্তিমানসের এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ততার চিত্র এঁকেই মানিক এ-গল্পের সমাপ্তি টানেনি। তিনি জানতেন, এই হীনতা আমাদের সমাজ-মানসেরই এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সে-কারণে গল্পের শেষে দেখা যায়-নিত্যদিনের কদর্যবৃত্তিশেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে যাদব একদিন ট্রামের জন্য অপেক্ষমান–এমন সময়ে অদূরে পোশাক-পরিচ্ছদ-চেহারায় সম্পূর্ণরূপে ভদ্র এক ব্যক্তিকে দেখে নিজেই তার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার কথা যখন ভাবে, তখন ওই ব্যক্তিই

এগিয়ে এসে যাদবকে অবাক করে দিয়ে তারও চেয়ে অভিনব ও নিপুন পদ্ধতিতে সাহায্য প্রার্থনা করে। গল্পের শেষ বাক্যটি নিম্নরূপ : 'স্তম্ভিত বিস্ময়ে যাদব তার মুখেরদিকে তাকিয়ে থাকে, যেভাবে জুনিয়র উকিল হাঁ করিয়া শোনে বিখ্যাত আইনজীবীর বক্তৃতা'।

এ গল্পে যাদব মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতিনিধি। সে পঙ্গু বা অন্ধ নয়, বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিচ মনোবৃত্তির কারণেই সে ভিক্ষার পথ বেছে নেয়। মানুষের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা ও সে করে তবে এক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়; মানুষকে প্রতারণাই হয়ে ওঠে–তার পেশার অঙ্গ। মানিক এ গল্পে সমাজ ও জীবনের এই সত্যকেই উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী বলেন "ভিক্ষুক গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য স্পষ্টই চোখে পড়ে, কিন্তু তা যৌন মনস্তত্ত্ব নয়, আর সেই সব বিভিন্ন ধরনের মানসজটিলতার সঙ্গে গ্রন্থিজালে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা"।[৩৬]

[৩৬] গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, মানিক বন্দোপাধ্যায় ঃ জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি (কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮), পৃ: ১২৭

'আততায়ী' (সমুদ্রের স্বাদ) গল্পে মানিক মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, ক্রুরতা, হিংস্রতা ও পাশবতার নগ্ন রূপ উদঘাটিত করেছেন। গল্পের প্রথম বাক্যটি এইরূপ : 'স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রধারী, এবং ধন ক্ষেত্র ও স্ত্রী অপহারক আততায়ী।'

গল্পের কাহিনীতে দেখা যায়, দিবাকর ও কৃত্তিবাস উভয়ে সতীর্থ, প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু। স্কুল-পালিয়ে বালকসুলভ ক্রীড়াকর্মে দিন কাটানো ছিল তাদের স্বভাবে অঙ্গ। অভিভাবকদের দৃষ্টিতে এমন অন্যায় কর্মে নিয়োজিত থাকার পরিণতিতে একদিন উভয়ে কৃত্তিবাসের পিতা কর্তৃক নির্দয় প্রহারের শিকার হলে দুজনেই গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। আর তার পূর্বে প্রতিশোধবশ, দিবাকরের বুদ্ধিতে, নিজেদের গৃহেই করে অগ্নিসংযোগ, উভয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় কলকাতায়, কৃত্তিবাসের নিঃসন্তান পিসির গৃহে। পিসির উপযুক্ত স্নেহ-আদরে সেখানেই দুজনের অধ্যয়নকর্ম অগ্রসর হয়। উভয়ে একসময় এমবিবিএস পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়।

পিসি কৃত্তিবাসের, কিন্তু তার অধিকাংশ স্নেহ আদায় করে দিবাকর, কৃত্তিবাসের বিবাহ সংক্রান্ত জটিলতায় কৃত্তিবাসের ওপর তার পিসির বিরূপতা বৃদ্ধি পেলে পিসির পূর্ণতর স্নেহ উপভোগ করে দিবাকরের দিন যখন অতিসুখে অতিবাহিত হতে থাকে ঠিক তখন পিসির হৃদরোগ চিকিৎসায় আফিম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে সে তাকে পরোক্ষভাবে হত্যা করে। পিসির মৃত্যুর পর তার অলংকার ও জমাকৃত অর্থের মালিক হয় দিবাকর। উভয়ের এমবিবিএস পাশর পর কৃত্তিবাসের অর্থেই প্রতিষ্ঠিত হয় চিকিৎসাকেন্দ্র। অথচ তার কর্তৃত্ব থাকে দিবাকরের হাতে, কৃত্তিবাসের স্ত্রী এসে দুই বন্ধুর সেবাকর্মে নিয়োজিত হলে দিবাকর তাকে করায়ত্ত করার ষড়যন্ত্রস্বরূপ কৃত্তিবাসের চোখে করে অস্ত্রোপচার। চিরতরে অন্ধত্ব বরনের পরই কৃত্তিবাস উপলব্ধি করে বন্ধুর চরম অকৃতজ্ঞতা ও প্রতারণার স্বরূপ।

ক্ষোভে-অভিমানে অতঃপর নিজ স্ত্রী ও সকল সম্পত্তি রেখে সে হয়ে যায় নিরুদ্দেশ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ গল্প সম্পর্কে বলেছেন "সমাজের অন্তরচারী ক্রুরতা ও হিংস্রতার উন্মোচনে 'আততায়ী' গল্পটি প্রায় চরমরূপ ধরেছে। গল্পের আরম্ভেই লেখক শাস্ত্রমতে আততায়ীর সংজ্ঞা দিয়ে তারপর নির্ভুল নিষ্ঠুরতায় বন্ধুত্বের স্বরূপ দেখিয়েছেন। কেমন করে এক বন্ধু অপর বন্ধুর সর্বনাশ করে, তাকে অন্ধ করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকেও আয়ত্ত করেছে, শীতল মস্তিষ্কে নরহত্যা করাবার ভঙ্গিতে সে-কাহিনী বর্ণনা করেছেন লেখক।"[৩৭]

গোপিককানাথ রায় চৌধুরী বলেন 'আততায়ী'-তে দেখি বন্ধুত্বের বাইরের মেকী ছদ্ম আবরণের তলায় প্রতারণা ও অর্থলোভের কী ভয়ংকর মর্মান্তিক ছবি। দিবাকরের আপাত-মধুর ভদ্র-ব্যবহারে বন্ধু কৃত্তিবাসের পিসিমা মুগ্ধ হয়ে তাকেই (দিবাকারকে) যেন বেশি স্নেহ করতে লাগলেন। অথচ শেষে পিসিমার আফিমের পরিমাণ অতিরিক্ত বাড়িয়ে তাঁরই মৃত্যু ঘটাল দিবাকর। এর ফলে নিঃসন্তান পিসিমার সমস্ত সম্পত্তি তার হস্তগত হল। এখানেই শেষ নয়। এরপর ক্ষীণ-দৃষ্টি বন্ধুর চোখ অপারেশনের নামে তার দুচোখই নষ্ট করে দিল চক্ষু-চিকিৎসক দিবাকর। অসহায় অন্ধ কৃত্তিবাস একাই গৃহত্যাগ করল। শেষ পর্যন্ত কৃত্তিবাসের জমি বিক্রির টাকা ও তার স্ত্রী দুই-ই করায়ত্ত হল দিবাকরের। অর্থ লোভের এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক রূপের কাহিনী স্বভাবতই মনে আনে জগদীশ গুপ্তের 'পয়োমুখম'-এর মতো গল্পকে। এই দুটি গল্পের দুই লেখকই যেন মানুষের নৈতিক সত্তার ওপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। মানবমনের নিশ্চিদ্র অন্ধকারে সেখানে আলোর সামান্যতম স্ফুলিঙ্গও চোখে পড়ে না।"[৩৮]

[৩৭] সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮
[৩৮] গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮

বিবেক (সমুদ্রের স্বাদ) গল্পে দারিদ্র্যের তীব্র নির্মম পীড়নের নিখুঁত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। শহুরে কেরানি মধ্যবিত্ত ঘনশ্যাম চাকরিচ্যুতির ফলে কপর্দকশূন্য। এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রী তার মৃত্যুশয্যায়। স্ত্রীর জীবনরক্ষার জন্য এক দিকে তার বিবেক তাড়না অন্যদিকে আর্থিক দীনতা হেতু এরূপ সংকট থেকে উদ্ধারকল্পে সমস্ত বিবেকশূন্য তৎপরতায় তার লিপ্ত হওয়ার কাহিনীই এ গল্পকে তাৎপর্য দান করেছে। সহধর্মিনীর জীবনরক্ষার অন্তর্তাগিদই ঘনশ্যামকে কিভাবে একে একে তার মানবিক গুণাবলি বিসর্জনে বাধ্য করে এবং তার দ্বন্দ্বক্ষতজর্জর মনে এই বিসর্জন ও পতনপ্রক্রিয়া কীরূপ স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দেয়–সেসবই এ গল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। অসচ্ছলতার মধ্যেও মধ্যবিত্ত জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো তার ভদ্রোচিত মানসিকতা, অথচ চরম আর্থিক অনটনের অভিঘাতে কিভাবে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সেখানে চৌর্যবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তির মতো নীচতা সংকীর্ণতা ও মনুষ্যত্বহীনতা প্রভৃতি প্রাধান্য অর্জন করে–ঘনশ্যামের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তার পরিচয় আমরা পাই।

তাছাড়া আর্থিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও সৌন্দর্য ও রুচির গৌরববোধ মধ্যস্তরের জবিনেরই অংশ, কিন্তু বিরূপ পরিস্থিতি ওইসব অহংকারকেও চূর্ণবিচূর্ণ করার ব্যাপারে সে যে বেপরোয়া ও বিদ্রোহপরায়ণ হয়ে ওঠে, তাও ওই জীবনস্তরেরই বৈশিষ্ট্য এ গল্পে আমরা এই দুই উপাদানের রূপায়নই লক্ষ করি। অর্থাৎ চরম দারিদ্র্য একটি মধ্যবিত্ত জীবন মনকে কিভাবে ভেঙ্গেচুরে দলিতমথিত করে পুরোপুরিভাবে ভিন্ন একটি কাঠামোয় রূপান্তরিত করে, ঘনশ্যাম চরিত্র নির্মাণে মানিক তারই আলেখ্য রচনা করেছেন।

ঘনশ্যাম তার স্ত্রীর চিকিৎসার অর্থসংগ্রহের জন্য ধনীবন্ধু অশ্বিনীর দ্বারস্থ হলে সেখানে সে অসহনীয় অপমানের শিকার হয়। অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও ঘনশ্যাম অশ্বিনীর বৈঠকখানা থেকে যে সোনার ঘড়ি চুরি করে তা আবার পরে ফেরৎ দেয়, কিন্তু তার গরীব বন্ধু শ্রীনিবাসের সর্বশেষ সম্বল স্ত্রীর অলংকার বন্ধকের টাকা চুরির ব্যাপারে ঘনশ্যামের মধ্যে কোন গ্লানিবোধ কাজ করে না। দারিদ্র্যের পীড়নে পিষ্ট ও সংকুচিত ঘনশ্যামের মনে মনুষ্যত্বহীনতা পীড়াবোধ

করে না। আর্থিক দৈন্য কিভাবে একটি মানুষের জীবনে সীমাহীন মানসিক দীনতারও কারণ হয়ে হয়ে ওঠে–ঘনশ্যাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানিক সেই সত্যকেই রূপায়িত করেছেন।

ঘনশ্যামের মধ্যে দুই বন্ধুর প্রতি দুই ধরণের আচরণ লক্ষ্য করা গেছে। ধনী বন্ধু অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি চুরি করেও ফেরত দেয় যার কোন অভাব না থাকা সত্ত্বেও অন্যদিকে গরিব বন্ধুর সর্বশেষ সম্বল টাকার ব্যাগ লুকিয়ে রাখে। ঘনশ্যামের মনে অশ্বিনী ও শ্রীনিবাসের অনুভবের এই ভিন্নতাকে মানিক উপস্থাপন করেছেন এভাবে "তার ব্যাগ লুকানোকে শ্রীনিবাস নিছক তামাসা ছাড়া আর কিছু মনে করিত না। এখনো যদি ব্যাগ বাহির করিয়া দেয়, শ্রীনিবাস তাই মনে করিবে। তাকে চুরি করিতে দেখিলেও শ্রীনিবাস বিশ্বাস করিবে না যে সে চুরি করিতে পারে। কিন্তু কোনরকমে তার পকেটে ঘড়িটার অস্তিত্ব টের পাইলে অশ্বিনী তো ওরকম কিছু মনে করিত না। সোজাসুজি বিনা দ্বিধায় তাকে চোর ভাবিয়া বাসিত।' অর্থাৎ মানবিকতার প্রশ্ন নয়, চৌর্যবৃত্তি ন্যায় কি অন্যায় সেই নীতিবোধ নয়-আসলে ঘনশ্যামের কাছে প্রাথমিকভাবে প্রধান হয়ে উঠেছে কে তাকে চোর ভাবতে পারে কে পারে না-এই বাহ্যিক বিষয়টি, অন্যের মূল্যায়নের মধ্যেই সে নিজের মর্যাদার হ্রাস বৃদ্ধিকে যাচাই করে। নিজ বিবেকের কাছে সৎ থাকার প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর। মধ্যবিত্ত মানসিকতার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে এভাবে মানিক রূপায়িত করেছেন।

'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন–

'বিবেক' গল্পের ঘনশ্যাম যখন বড়লোক বন্ধুর চুরিকরা ঘড়ি ফিরিয়ে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির গোপন অনুপ্রেরণায় নিজের বিবেককে নিরঙ্কুশ করে, অথচ সেই সঙ্গে দরিদ্র নিরুপায়, পরম হিতকামী সমগোত্রীয় বন্ধুর মানিব্যাগ চুরি করতে তার বাধে না-তখন মধ্যস্বত্বভোগীর স্ববিরোধের রূপটি চূড়ান্তভাবেই অভিব্যক্ত হয়।"[৩৯]

[৩৯] সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৪

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন "ঘনশ্যামের বিবেকেও (বিবেক) বন্ধুত্বের খাদ। ধনী অশ্বিনীর অবজ্ঞা পেয়েও তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখার আগ্রহ, তাই ঘনশ্যাম চুরির ঘড়িটি ফেরত দিল, গরীব শ্রীনিবাসের প্রতি বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা, তার পুত্রের জন্য মমতা, সবই ঘনশ্যামের বিবেকের এলাকার বাইরে সব মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত এই শ্রেণী এখন দিগ্‌ভ্রান্ত।"[৪০]

তবে মধ্যবিত্ত ও শ্রেণিস্তর সম্পর্কে সর্বশেষ মন্তব্যটি অনেকটা সরলীকরণ প্রসূত। চরম সংকটের মধ্যে পতিত হয়ে একটি মধ্যবিত্ত জীবন তার আত্মমর্যাদাবোধ থেকে শুরু করে সকল সততা আন্তরিকতা ও নীতিনিষ্ঠা জলাঞ্জলি দিতে কেমন অকৃপণ হয়ে ওঠে সেটা দেখানোই ছিল মানিকের লক্ষ্য।

[৪০] পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৫

একটি খোয়া (সমুদ্রের স্বাদ) – মানিকের প্রথম রাজনৈতিক গল্প একটি খোয়া। স্বদেশী রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার দায়ে তিনবছরের কারাবাস শেষে বছরকাল যাবৎ নিজগৃহে অন্তরীণ যুবক জহরকে উপলক্ষ করে প্রতিবেশী-আত্মীয় রায়বাহাদুরের আশাভঙ্গ ও কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহিতা, জহরের নিজ সংসারে দুরবস্থা, জ্যেষ্ঠভ্রাতার চাকরিচ্যুতি, সর্বোপরি এক সীমাহীন আতঙ্কগ্রস্থতা এবং যার স্বীকার হয়ে জহরের নিজেরই মানসিক ভারসাম্যচ্যুতি প্রভৃতি এ গল্পের কাহিনীকে করেছে বৈচিত্র্যদীপ্ত ও সমৃদ্ধ।

জহরের প্রতিবেশী ও আত্মীয় রায় বাহাদুরের কন্যার বিয়ে উপলক্ষে তার গ্রামের বাড়িতে আয়োজিত বিশাল আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান নিয়ে এ গল্পের শুরু। ওই অনুষ্ঠানে জহর ছাড়া তার বাড়ির সকলেই নিমন্ত্রিত। জহরের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ: ওই অনুষ্ঠানে এমন কিছুসরকারি কর্তাব্যক্তির আগমন ঘটবে, জহরের উপস্থিতি, যাদের সামনে রায়বাহাদুরকে করে তুলবে বিব্রত। যে জহরকে এক দিন রায় বাহাদুর অতিশয় স্নেহবশত নিজগৃহে রেখে পড়াতেন, নিজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে চিরদিন কাছে রাখার কল্পনা করতেন–রাজনৈতিক সম্পৃক্তির কারণে সরকারি রোষের শিকার হওয়ায় আজ সেই তার মেয়ের বিয়েতেও আমন্ত্রিত হওয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকারী বিপ্লবীরা কত বিপজ্জনক ভয়ানক বলে বিবেচিত হতো, এ ঘটনায় তার প্রমাণ মেলে। জহরের সঙ্গে আত্মীয়তার ক্ষীণসূত্র থাকায় রায় বাহাদুরকেও কর্তৃপক্ষের নিকট কম জবাবদিহি করতে গল্পের দ্বিতীয় পর্বে অঙ্কিত হয়েছে রায় বাহাদুরের নিমন্ত্রণ রক্ষার ক্ষেত্রে জহর-পরিবারের অতিমাত্রায় ব্যস্ততা ও আগ্রহের নেপথ্য কারণ। জহরের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টির কারণে তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মনোহর চাকরিচ্যুত হওয়ায় সমগ্র পরিবারে যে অসচ্ছলতা, তা দূরীকরণার্থে রায়বাহাদুরের সন্তুষ্টি বিধান আবশ্যক। আর সেই উপলব্ধি থেকেই জহরের বৃদ্ধ অসুস্থ শয্যাশায়ী পিতা চড়া গলায় সকলকে তাগিদ দিয়ে বলেন: 'কি করছ তোমরা, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও? আমি যেতে পারছি না, তোমরাও দেরি করে যাবে, এক ফোঁটা আক্কেল কি কারা নেই তোমাদের? আরও সর্বনাশ ঘটাতে চাও মানুষটাকে চটিয়ে?"

এ মনোভাব শুধু তার একার নয়, সমগ্র সংসারের। তবে এ-পরিবারের একমাত্র সদস্য জহরের বোন শান্তির কাছেই পরিবারের সর্বনাশের চেয়ে ভাইকে নিমন্ত্রণ না করার অপমানের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পায়। আর তার প্রতিবাদে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সে জানায় অস্বীকৃতি। কিন্তু শান্তির এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মমর্যাদা সচেতন সিদ্ধান্তের চেয়েও এ গল্পের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো তার প্রতিবাদের ফলে সমগ্র পরিবারে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সেটি। মানিকের ভাষায়-

'মা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, 'দিদি যখন সুধোবে শান্তি কই, আমি কি জবাব দেব লো হারামজাদি? মরে গেছিস, হাড় জুড়িয়েছে, তাও যে বলতে পারব না, পুকুর ঘাটে ওবেলা তোকে দেখেছে নিজের চোখে।'[৪১]

দরজার কাছ হইতে বৌটির নিচু ঝাঁঝাঁলো গলার মন্তব্য শোনা গেল, 'ভাই চাকরি খেয়েছেন, রায় বাহাদুরকে ধরে একটু সুবিধের চেষ্টা দেখবে দাদা, তা কেন সইবে বোনের"।

মনোহর মোড়া ছাড়িয়া উঠিয়া শান্তির সামনে দাঁড়াইল, 'যাবি নাই তুই? যাবি না?

শান্তি বোধ হয় মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়াছিল, মিহিরের চোখে পড়ে নাই, শান্তির গালে মনোহরের চড়টাই শুধু তার চোখে পড়িল, শব্দটা কানে আসিল।

আর্থিক দৈন্য কিভাবে মানসিক দৈন্যেরও কারণ হয়ে ওঠে, এসব প্রতিক্রিয়া তার প্রমাণ। জহরের প্রতি সংসারের এই সহানুভূতিহীন আচরণের মূলে রয়েছে তার কারণে সৃষ্ট সমগ্র সংসারের দারিদ্র্য ও সামাজিক প্রতিকূলতার। মধ্যবিত্ত মানসিকতাই একটি জটিল প্রান্ত এখানে উন্মোচিত হয়েছে। জহরের রাজনৈতিক সংযোগ যদি পরিবারের জন্য সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্যতা ও আর্থিক সমৃদ্ধি বয়ে আনত, তাহলে সমগ্র সংসার তাকে নিঃসন্দেহে মাথায় করে রাখত। ওইরূপ সংযোগে নীতি বা আদর্শচ্যুতির কারণ ঘটছে কিনা সংসারের কাছে তা বিবেচ্য হতো না। এক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে মধ্যবিত্ত সংসার দুঃখের অংশীদার হওয়ার পরিবর্তে সর্বদা হয় সুখের প্রত্যাশী–এই মনোভাবটিই গল্পের এ-অংশে চমৎকারভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

[৪১] পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৮

মেয়ে (ভেজাল) – গল্পটিতে উদঘাটিত হয়েছে জীবন-রহস্যের জটিল জাল, মানবমনের নিগূঢ় বৈচিত্র্যের একটি বিশেষ প্রান্ত। পিতা-পুত্রীর সম্পর্কের এক ইঙ্গিতধর্মী, অপ্রকাশ্য বেদনাময় রূপ অঙ্কিত হয়েছে এ গল্পে।

এ গল্পের কাহিনীসীমা বিস্তৃত নয়। নিয়মিত মদ্যপায়ী নীরদ ঘোষাল প্রতিদিন গভীর রাতে উন্মত্ত অবস্থায় গৃহে ফিরে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করলে তা ছিল পাড়া প্রতিবেশীর নিকট অতিশয় উপভোগের বিষয়। জ্যেষ্ঠসন্তান চারু যখন নবম শ্রেণীর ছাত্রী তখন চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত এই নীরদ ঘোষাল অকস্মাৎ তার পানাভ্যাস পুরোপুরিভাবে পরিত্যাগ করে তার যুক্তি: 'ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে ওসব ছাড়তে হয় পুরুষ মানুষকে'।

অতঃপর সহযোগী বন্ধুদের কোন অনুরোধ কিংবা প্রলোভনের কাছে সে আর নতি স্বীকার করে না। এদিকে চারু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতার সেবাযত্নের দায়িত্ব মাঅনুরুপার কাছ থেকে, সবার অলক্ষে ক্রমশ তার উপর অর্পিত হয়। অবচেতন মনে স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা বা বিদ্রোহের কারণেই হয়ত একান্ত প্রয়োজন ও অভ্যাস ছাড়া স্বামীর কাছে যাবার তাগিদ অনুরূপা অনুভব করে না। ফলে নীরদ ঘোষালের জলের গেলাস, চায়ের কাপ, খাবারের রেকাবি, ভাতের থালা প্রভৃতি সামনে পৌঁছে দেয়া কিংবা তার জামা-কাপড়, পোষাক পরিচ্ছদের হিসাব রাখা, বিছানা পাতা, চটি এগিয়ে দেওয়া, বাতাস করা, ঘামাচি মারা ইত্যাদি সমুদয় কাজের ভার পড়ে চারুর ওপর। এই সেবাসূত্রেই চারু তার পিতার নৈকট্য লাভ করে। কিন্তু গৃহশিক্ষক যখন এসব কাজের ফলে পড়াশুনার ত্রুটির কথা জানায়, তখন নীরদই কন্যাকে তার সেবাযত্ন থেকে রাখে বিরত। আর সেই অবসরে যুবক গৃহ শিক্ষক জগতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ ঘটে চারুর। চারুর আগ্রহ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জগৎ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে নীরদ ঘোষাল তাকে শুধু আপত্তিই করেনি, জগতের জন্যে তার গৃহে প্রবেশও নিষিদ্ধ করে। কিন্তু কন্যার সম্মতিই তার পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গল্পের উপসংহার অংশে আমরা লক্ষ করি, পূর্বের মত গভীর রাতে মাতাল হয়ে গৃহে ফিরছে নীরদ ঘোষাল।

যে জীবনোদ্যম নীরদ ঘোষালকে পানাভ্যাস পরিত্যাগ দৃঢ় ও সাহসী করে তুলেছিল তার অনুপস্থিতিতে সে আবার ওই হতাশাগ্রস্ত তিমিরে নিক্ষিপ্ত হয়। মেয়ে বড়ো হয়ে পিতার কাছে মায়ের অনেকখানি জায়গাই দখল করেছিল। নীরদ ঘোষালের দৃষ্টিতে তার কন্যার অবয়বই তাই মানিকের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ 'অনুরূপার সরু কাঠির মতো দেহ থেকে সে যেন বেরিয়ে এসেছে নতুন একটি সংস্করণের মতো, রোগার বদলে ছিপছিপে হয়। মায়ের প্যাঙাসে মুখের গড়নটি শুধু পায়নি। কিন্তু জগতের প্রতি চারুর প্রণয় উন্মেষের পর নীরদ ঘোষাল 'মেয়ের মুখে তার মা'র মুখের প্যাঙাসাপনার আবির্ভাবের সূচনা দেখতে পায়।

তরুণী কন্যার হৃদয়াকর্ষণের প্রয়াস এবং সেক্ষেত্রে অসমর্থ হওয়ার ফলে এক প্রকার পরাভব চেতনা, আশাহত বেদনা নীরদ ঘোষালকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সর্বশেষ তার এই নিরাশাক্লিষ্ট মন সকল সবলতা হারিয়ে পুনরায় আসক্তির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে বেঁচে থাকার নেতিবাচক আস্বাদ অনুভব করে।

কন্যা চারুকে কেন্দ্র করে নীরদ ঘোষালের সমগ্র আচরণ ব্যাখ্যা করলে সন্তান-বাৎসল্যের অতিরিক্ত কোনো আকর্ষণের উপস্থিতি আমরা এই সম্পর্কের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'ইলেকট্রা কমপ্লেক্স' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ গল্প প্রসঙ্গে দুজন সমালোচকের অভিমত বিশ্লেষণযোগ্য:

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাপ ও মেয়ের সম্পর্কবৈশিষ্ট্যটি ভাল করিয়া ফুটে নাই – মেয়ের সেবা-শুশ্রূষা ও বাপের শুভানুধ্যায়ী স্নেহের পিছনে কোমলতার পরিবর্তে এক প্রচ্ছন্ন জবরদস্তি ও একগুঁয়েমির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে.....কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিতগুলি উদ্দেশ্যের সূত্রগ্রথিত হইয়া সুসংবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে নাই।"[৪২]

সত্যপ্রিয় ঘোষ : 'মেয়ে' গল্পের বিষয়বস্তু পিতা-পুত্রীতে আসঙ্গলিপ্সা। ইলেকট্রা কমপ্লেক্স।[৪৩]

[৪২] পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪০
[৪৩] পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪০

যে বাঁচায় (ভেজাল) গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে দুর্ভিক্ষ জনিত প্রতিক্রিয়া এবং তার করুণ ও ভয়াবহ পরিবেশের মর্মন্তুদ ছবি। এ গল্পের কাহিনীতে দেখায় যায়, অতিরিক্ত শ্রেণিশোষণ, প্রশাসনিক লুণ্ঠন ও ঔদাসীন্য, সীমাহীন মুনাফালোভ প্রভৃতির পরিণতিতে সর্বদা অনিবার্য হয়ে ওঠে দুর্ভিক্ষ; অন্যদিকে মন্বন্তরকালেও এই সবকিছু আরও অধিকমাত্রায় শুধু অব্যাহতই থাকে না, তার প্রকোপ অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে দেখা যায়, অনাহার ও মহামারী একদিকে যখন হয়ে ওঠে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর কারণ। ঠিক তখন কালোবাজারি ও অন্যান্য ধনিক ব্যবসায়ী উন্মাদ হয়ে ওঠে অবৈধ প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্যমাত্রায় সম্পদবৃদ্ধির নেশায়। দুর্ভিক্ষের সুযোগে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের দ্রুত ও হঠাৎ ধনস্ফীতির বিষয়টি এ গল্পে আভাসিত হয়েছে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণে ঃ

"ধনঞ্জয় নিজেই যে ফাঁপছিলেন তা নয়, তাঁর জানাশোনা আরও অনেকে ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছিল। লোকের প্রয়োজনও বেড়েছিল সেই অনুপাতে-অফিসে, কারখানায়, এবং মফস্বলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এটা ওটা গড়ে তোলবার স্থানে।"

এ গল্পে অক্ষয় পরিবারের করুণ ও বিষাদাত্মক পরিণতিকে কেন্দ্র করে চিত্রিত হয়েছে দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে বিভীষিকাপূর্ণ নৃশংস ও রোমহর্ষক রূপ। অক্ষয় কারাগারে, কেন সে কারাবন্দি তার কোন বিবরণ নেই, অনুমান করা যায়, জনকল্যাণমূলক রাজনীতিতে অংশগ্রহণই তার বন্দিত্বের কারণ। অক্ষয়ের অনুপস্থিতিতে অভিভাবকহীন তার বোন নলিনী ও বৃদ্ধা মা অনাহারের পীড়নে অসহায়। খাদ্যাভাবের তাড়নায় তরুণী নলিনী গৃহত্যাগে বাধ্য হয়, মাকে সঙ্গে নিতে চেয়েও তার প্রবল আপত্তির কারণেই সে ব্যর্থ হয়। নলিনী শহরে গিয়ে ত্রাণতৎপরতায় অংশগ্রহণ করে, অন্যদিকে সম্পূর্ণ খাদ্যহীন নিঃসঙ্গ পরিবেশে গ্রামের এক প্রান্তে সকলের অগোচরে তার বৃদ্ধা মা মরে পচে শিয়ালের খাদ্যে পরিণত হয়।

নলিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানিক একটি আত্মমর্যাদাসতর্ক ব্যক্তিত্বময়ী নারীর রূপ অঙ্কন করেছেন। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মধ্যবিত্ত মানসিকতার একটি দিক উন্মোচিত হয়েছে তার আচরণে। দুঃস্থ ও বিপর্যস্ত অবস্থায়ও ত্রাণ বা দান গ্রহণে মধ্যবিত্ত মানসে যেরূপ লজ্জা সংকোচ বা কাতরতার পরিচয় পাই, নলিনী তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। অপরের করুণানির্ভর মর্যাদাহীন বেঁচে থাকার পরিবর্তে সে সংগ্রামময় জীবনে অবতীর্ণ হয়। অন্যদিকে এরই পাশাপাশি মধ্যবিত্ত মানসিকতার অন্য একটি অশ্রদ্ধেয় মেরুদন্ডহীন রূপ অঙ্কিত হয়েছে এ গল্পে। ধনঞ্জয় প্রতিষ্টিত ও তারই অর্থে পরিচালিত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভূপতি দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে কেবল বেঁচে থাকার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এ-উদ্দেশ্যে ধনঞ্জয়ের সন্তুষ্টিবিধান কল্পে তারই কর্মচারী মাধবকে তোষামোদের ঘটনায় ভূপতির হীনমন্যতার পরিচয় হয় স্পষ্ট। একই দুর্যোগ সমশ্রেণিভুক্ত দুই মানুষের জীবনে যে-দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, মানবমনের বৈচিত্র্যদীপ্ত গঠনই তার কারণ-মানিক এই সত্যকেই নলিনী ও ভূপতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন। অর্থ ও সম্পদের অভাব কিংবা প্রাচুর্য–এই উভয়ই মানবতাকে করে তোলে বিপন্ন বিপর্যস্ত–সেই সমাজসত্যের দিকেও এ-গল্প অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

'নমুনা (আজকালপরশুর গল্প)–যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে যে ভয়ংকর আর্থিক বিপর্যয় সারা দেশের মানুষকে গ্রাস করেছিল– তার মধ্যে শুধু কৃষক ও শ্রমজীবীর মতো তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মানুষ নয়, মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণির মানুষও ছিলেন অসংখ্য। মধ্যবিত্ত মানুষ নিঃস্ব হলে প্রতিবাদ–প্রতিরোধের নৈতিক সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। এখানেই এই শ্রেণির সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। এরা প্রতিরোধের পরিবর্তে আত্মসমর্পণ করে বসে বিবেকহীন দুর্নীতি ও ব্যাভিচারের কাছে। বাইরের মিথ্যা ভদ্রতা ও মর্যাদার জীর্ণ আবরণটুকু কোনক্রমে বজায় রাখার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় অসহায় এই ভদ্রলোক শ্রেণিকে সবার অলক্ষ্যে গোপনে হাত মেলাতে হয় 'নমুনা' গল্পের কালাচাঁদের মতো ঘৃণ্য নারীদেহ ব্যবসায়ীর সঙ্গে।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ও ভেজাল ঔষধের কারণে উপার্জনক্ষম পুত্র ও আরেক কন্যার মৃত্যুর ঘটনা এবং দুর্ভিক্ষজনিত সংকটে পরিবারসহ কেবল অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে সর্বস্বহারা হওয়ার পর কেশবের অনুভূতিগুলোর সতেজতা যায় বিনষ্ট হয়ে। কেশবের এমন নৈরাশ্যপিষ্ট নির্জীব মানসিক পরিস্থিতিতে নারী ব্যবসায়ী কর্তৃক তার কন্যা শৈলকে ক্রয়ের প্রস্তাব যখন আসে, তখন পিতা হিসেবে তার মনে কোন প্রতিক্রিয়াই তীব্র হয়ে ওঠে না, ক্ষোভ অপমানবোধ কিংবা আত্মগ্লানি–এর কোনটিই তার পিতৃহৃদয়কে করে না জর্জরিত। দুর্যোগকালীন অবস্থায় গ্রামে আরও দুটি কন্যাবিক্রির ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর কাঁলাচাদের এমন প্রস্তাবে সে বিস্মিত হয় না। বরং মৃত কন্যাটির কথা ভেবে তার মনে জাগ্রত হয় স্নেহ-সহানুভূতিহীন এক নির্মম আফসোসঃ 'শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোটে বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও ছিল শৈলর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন, নগদ টাকা ফাউ।" খাদ্যাভাব, জীবনরক্ষার তাগিদ প্রভৃতি কেশবের পিতৃত্ব ও মনুষ্যত্বকে কী সীমাহীনভাবে বিপন্ন করে তুলেছে গল্পের এ অংশটি তার প্রমাণ সকল মূল্যবোধ, নীতিবোধ ও ধর্মবোধকে ছাপিয়ে জীবনের সবচেয়ে আদিম ও শাশ্বত চাহিদার আকাঙ্ক্ষায় একমাত্র সত্য হয়ে থাকে।

তবে এ গল্পটিতে দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত কালাচাঁদের অমানবিক আচরণের চিত্রটি যদিও মুখ্য, তবু এরই মধ্যে লেখক তার মতো হৃদয়হীন পাষন্ডের মনে মানবিক অনুভূতির ক্ষণিক স্ফূরণের আভাস দেওয়ায় গল্পটি নিছক বক্তব্য সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। শৈলর বাবা প্রবীণ ব্রাহ্মণ কেশবের করুণ মিনতিতে সাড়া দিয়ে ঘরের 'শিলারূপী নারায়ণ' কে সাক্ষী রেখে কালাচাঁদ শৈলর পাণি গ্রহণ করে। এই ঘটনায় কালাচাঁদের মত কদর্য চরিত্রের মানুষ যেন ঈষৎ অভিভূত হয়ে পড়ে। এমন কি শৈলকে পতিতাবৃত্তিতে যুক্ত না করে নিজের সংসারে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্মর অর্থলালসার কাছে তার এই ক্ষণিক ইচ্ছা লুপ্ত হয়ে যায়। কদর্য জীবনের গভীর অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় গ্রামের অসহায় নিষ্পাপ মেয়ে শৈল। অর্থলালসার কাছে মনুষ্যত্বের এই পরাজয়ের বিষয়টি গল্পের এ অংশে শৈল্পিক নিপুণতায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি এ গল্পে অর্থনৈতিক দিক– থেকে উচ্চতর শ্রেণির হাতে মার খেতে খেতে মধ্যবিত্ত মানুষ (নমুনা) গল্পের শৈলর বাবা কেশবের মতো দুর্বল ও ভীরু হয়ে যায়। এই মর্মান্তিক সামাজিক সত্য যেমন মানিকের চোখে ধরা পড়েছে তেমনি এই মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যেও এক ধরনের পরোক্ষ প্রতিবাদী মনোভাব লক্ষ্য করেছেন।

যাকে ঘুষ দিতে হয় (আজ কাল পরশুর গল্প) – গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাখন ছিল দরিদ্রের সন্তান। মেধাবী ছাত্র হিসেবে একশো টাকা মাসিক বেতনের একটি চাকরি সে পেলেও স্ত্রী সুশীলার সচ্ছলজীবনাকাঙ্ক্ষা তাকে ব্যবসামনস্ক করে। দাস সাহেবের অনুগ্রহে যুদ্ধের দৌলতে কালোবাজরি কন্ট্রাক্ট নিয়ে ইদানিং বড়লোক হয়েছে। মাখন ও সুশীলার চরিত্র বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়, অসৎ পথে দ্রুত ধনী হওয়ার ফলে তারা উভয়ে অর্থের জন্য লোভাতুর, নেশাগ্রস্ত, সীমাহীন প্রলোভনে জীবন তাদের অস্থির ও চঞ্চল। আর এ কারণেই সোয়ালক্ষ টাকা লাভের একটি কন্ট্রাক্ট দেবার ফাঁদে ফেলে দাস সাহেব যখন সুশীলার সম্ভ্রম লুণ্ঠনে উদ্যত হয় তখন মাখন কিংবা সুশীলা কারো পক্ষে অর্থলোভ বিসর্জনপূর্বক প্রতিবাদী হওয়া সম্ভবপর হয় না। প্রলোভনের বেদীতে এভাবেই নতুন মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী শ্রেণির সম্ভ্রমবিসর্জনের ঘটনা ঘটে। দাস সাহেবের সুস্পষ্ট প্রস্তাবে 'সুশীলা আর মাখন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। পাখা ঘোরবার আওয়াজে ঘরের স্তব্ধতা গম্ গম করতে থাকে। মাখন আর সুশীলা দুজনেরই মনে হয় আওয়াজটা হচ্ছে তাদের মাথার মধ্যে–অকথ্য বিশৃঙ্খল উদ্ভট আওয়াজ"।

বৈদ্যুতিক পাখার শব্দ এবং মনের মধ্যে তার অনিয়ন্ত্রিত অবিন্যস্ত প্রতিধ্বনির এই বিবরণে আসন্ন বিপদ যেন সংকেতায়িত হয়। মাখন ও সুশীলা সেই সর্বনাশা বিপত্তির বার্তা জেনেও, সম্পদের সুতীব্র বাসনায়, বিদ্রোহ প্রকাশে বিরত থাকে। মাখন-সুশীলার প্রলোভনপুষ্ট জীবনপরিণতি সম্পর্কে সমালোচকদের কিছু তাৎপর্য মন্তব্য নিচে আমরা উদ্ধৃত করতে পারি :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : "যুদ্ধকালীন লোভবিকৃত মধ্যবিত্ত এবং দাস সাহেব শ্রেণীর উচ্চতর চরিত্রের exposition এ গল্পটি বীভৎস বাস্তবতার ফোটোগ্রাফিক নিদর্শন। মাখনের মানসিক অধঃপতনের মধ্যেই গল্পের আসল ট্রাজেডি সন্নিহিত। ত্রিশঙ্কু মধ্যজীবীর মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনি এই গল্পটিতে শুনতে পাওয়া যায়।"[৪৪]

[৪৪] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩০

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পে নিতান্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মাখনের ধনী হওয়ার নেপথ্য কাহিনীতে আছে এক চরম নীতিভ্রষ্ট কদর্য সামাজিক পরিবেশ। এই সমাজ পরিবেশে দ্রুত সম্পদ লাভের জন্যে গোপনে চরম মূল্য দিতে হয় মানুষকে–তা কেবল আর্থিক উৎকোচ নয়, নিজের স্ত্রীকেও সমর্পন করতে হয় দাস সাহেবের মতো লালসাগ্রস্ত ব্যভিচারী মানুষের হাতে।[৪৫]

[৪৫] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩১

'ছাঁটাই রহস্য' – গল্পটি যুদ্ধোত্তর পরিবেশে চাকরিচ্যুতির ব্যাপক উপদ্রবে কলকাতার সমাজ জীবনে যে-নীরব ও গোপন দুর্দশার শিকার হয় তার চিত্র। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে চাকরিচ্যুতির প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ মর্মস্পর্শী পরিস্থিতি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-বাসনাকে যেমন তা দুমড়ে-মুচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি দরিদ্র ও অর্থকষ্টজনিত আঘাতে আক্রান্ত পরিবারগুলোতে নেমে আসে বেদনা ও শোকের গাঢ় ছায়া। রুদ্ধ হয়ে পড়ে মধ্যবিত্ত জীবনের গতি বিকাশ ও আনন্দধারা। বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নিরাপত্তার স্থায়ী অভাব মানুষের জীবনে প্রচন্ড অভিশাপের কারণ হয়। অকারণ ও অকস্মাৎ চাকরিচ্যুতির এক সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তা মানুষের মনোজগৎকে যেমন পীড়াক্লিষ্ট করে, তেমনি দুর্ঘটনা, অসুস্থতা কিংবা বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার ফলে ক্ষতিপূরণহীন চাকরি জীবনের অবসানে আর্থিক সংকটের মহাসমুদ্রে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

যুদ্ধশেষে চাকরিচ্যুতির ফলে মহেশ, মিনতি ও সুধার সংসার জীবনে যে চরম দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাবে মৃত্যুর আশঙ্কাসহ সীমাহীন অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়, তার ভয়াবহতাকে মানিক এ গল্পে রূপায়িত করেছেন। অন্যদিকে যুদ্ধকালে চাকরি প্রাপ্তির সমস্যা এবং যুদ্ধশেষে চাকরিচ্যুতির সংকট মহেশ ও প্রতিমার প্রণয়বাসনাকে অতৃপ্তির এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। চাকরি স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব, বেতন-বৈষম্য, নিজ নিজ সংসারের পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণ এবং সবশেষে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা প্রভৃতি তাদের প্রণয়স্বপ্ন চরিতার্থতার পথে সৃষ্টি করে এক সুদৃঢ় প্রতিবন্ধকতা। মহেশ-প্রতিমার প্রণয়বাসনার এমন অনাকাঙ্ক্ষিত বেদনাদায়ক পরিণতির মূলে-যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সৃষ্ট চাকরি সংকটের ভূমিকাই প্রত্যক্ষ। বিশ্বযুদ্ধকালে মহেশ ও প্রতিমা উভয়কে নিজ নিজ সঙসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। মহেশের পিতা ছিল পেনশন প্রাপ্ত কর্মচারী। যুদ্ধজনিত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিশৃঙ্খলায় পেনশনের স্বল্প অর্থ দিয়ে সাংসারিক ব্যয়নির্বাহ কঠিন, ফলে একটি অস্থায়ী চাকরি পেয়ে মহেশকে যেতে হয় জব্বলপুর। প্রতিমার পিতা দীনেশ চাকরিতে বহাল থাকলেও সংসারের ব্যয়বৃদ্ধি প্রতিমাকে বাধ্য করে উপার্জনের

উপায় অবলম্বনে। যুদ্ধকালীন সংকটে, অতঃপর, দীনেশ চাকরিচ্যুত হলে প্রতিমার ওপরই অর্পিত হয় সংসারের সকল দায়িত্ব। তিনশো টাকার চাকরি হারিয়ে মহেশ যখন মাত্র ষাট টাকা বেতনের চাকির পায় তখন সে আরও বেশি হতাশায় আক্রান্ত হয়। এদিকে তার বাবা মারা যাওয়ায় পেনশনের অর্থও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এক ভয়াবহ আতঙ্ক তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়।

এরূপ আতঙ্ক আমরা প্রত্যক্ষ করি সুধা ও মিনতির পরিবারে। সুধার স্বামী সম্পূর্ণরূপে চাকরি না হারালেও বেতন অর্ধেক কমে যায়। ফলে শহরের বাস উঠিযে সংসারের সকলকে সে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। যুদ্ধত্তোরকালীন বিপর্যয় কিভাবে প্রিয়জনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তারই চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মহেশ, মাখন, মিনতির স্বামী ও ধীরণের চাকরি সংক্রান্ত দুর্দশাকে প্রত্যক্ষ করার পর প্রতিমার মধ্যে এক অনিশ্চয়তার আতঙ্ক গ্রাস করে। যে প্রতিমা অফিস ফাঁকি দিয়ে মহেশের সাথে গল্প করবে ভেবেছিল সেই প্রতিমা শঙ্কাগ্রস্ত হরিনীর ন্যায় দুপুর দেড়টায় ছুটে যায় কর্মস্থলে। তবে এসবের মধ্য দিয়ে তার মনোজগতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। সমষ্টির যন্ত্রণার আঘাতে তার ব্যক্তি জীবনের দুঃখ তুচ্ছ হয়ে যায়। মানিকের ভাষায় 'তার নিজের জীবনের সমস্যা ও ব্যর্থতা বৃহৎ ও ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে যায় অসংখ্য জীবনে, নিজেকে ভুলে সে ভাবতে থাকে অন্য সংখ্যাহীন মানুষের কথা'। নতুন এই জীবনবোধে উত্তরণের ফলে প্রতিমা সেদিন নিজগৃহে কর্মরত দাসী আহ্লাদীর অসহায়তা ও বিপন্নতার কথা শুনে ব্যথিত হয়। দাসীর দুর্গতির সঙ্গে নিজেদের দুঃখকষ্ট কে একাত্ম করে ভাবে। মধ্যবিত্ত জীবনে বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা তার সঙ্গে ওই দাসীর কর্মজীবনের নিরাপত্তাহীনতার সামঞ্জস্য আবিষ্কার করে প্রতিমা।

প্রতিমার নবতর আত্মোপলব্ধি নিম্নরূপ ঃ

"……দিন চালানোর দায়ে আহ্লাদী ছেলে নিয়ে বাসন মাজতে আসে তার ঘরে। এতো চিরদিন সে জানত, কিন্তু সে যে কেমন দায় আজকের মতো এমন মর্মে মর্মে কি জানতে পেরেছিল সে কোন দিন? যাঁতাকলে নিজের জীবনটা পিষে জেনেছে বলে, মহেশ, মিনতি, তার স্বামী, মাখন, তার মা, বৌ, সুধা, ধীরেন এদের জগতের জীবনগুলি পিষে যাচ্ছে অনুভব করেছে বলে, তবেই না আজ তার মনে পড়েছে এমন কত আহ্লাদী আর তার স্বামী আছে যারা গুঁড়ো হচ্ছে এই প্রেষণে? অন্ধকারে ছোট মেয়ের ভয় পাওয়ার মতো অদ্ভুত এক অন্ধ আতঙ্ক জাগে প্রতিমার"।

প্রতিমার জীবন এমন এক সদর্থক চেতনায় উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটায় এ গল্প নতুন এক তাৎপর্য অর্জন করেছে।

'টিচার' গল্পের দরিদ্র কিন্তু প্রতিবাদী স্কুল শিক্ষক গিরীন তার স্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুরের ফাঁকা আদর্শবাদের বুলি আওড়ানোর হৃদয়হীন ভন্ডামির মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছে। দারিদ্র-জর্জরিত গিরীনের বাড়িতে অন্নপ্রশাসনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনাকে আশ্রয় করে ধনী রায়বাহাদুরের ওপর লেখকের শানিত কঠিন ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শর নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

একজন স্কুল শিক্ষকের জীবনে দারিদ্র্যের সীমাহীন লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা এবং তা প্রত্যক্ষ করে স্কুল পরিচালনা কমিটির প্রধানের মনে করুণা সঞ্চার, কিন্তু ব্যক্তিত্ববান শিক্ষক কর্তৃক সেই করুণা প্রত্যাখ্যান এবং 'অপরাধে' চাকরিচ্যুতির নোটিশ লাভ প্রভৃতি ঘটনা শিক্ষক সমাজের দুর্দশা ও অসহায়ত্বকেই মূর্ত করে তোলে। রাজমাতা হাই স্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুর যখন জানতে পারেন সমগ্র বাংলাদেশের স্কুল শিক্ষকরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করছে তখন তিনি বলেন :

'স্বার্থ ভুলে, বিলাসের লোভ জয় করে, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে হাসিমুখে বরণ করে, বিদ্যালয়ের মহান আদর্শ যারা গ্রহণ করেছে, দেশের যারা ভবিষ্যৎ মেরুদন্ড তাদের গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব পালন যাদের জীবনের ব্রত, বুড়ো রামনাথ যাদের গর্ব ও গৌরব, তুচ্ছ দুটো পয়সার জন্য, সামান্য দুটো অসুবিধার জন্য, তারা নিজেদের নামিয়ে আনবে, আদর্শ চুলোয় দেবে, শিক্ষা-দীক্ষাহীন অসভ্য মজুর-ধাঙ্গড়ের মতো হাঙ্গামা করবে, তা কখনো হতে পারে না.....'।

শিক্ষকদের আর্থিক দৈন্য-সম্পর্কিত বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে কেবল-আদর্শগত অবস্থান থেকে তাদের কার্যক্রমের মূল্যায়ণ করলে তা ভ্রান্তিযুক্ত হতে বাধ্য।

পুত্রের অন্নপ্রাশনের কথা বলে টিচার গিরীন রায় বাহাদুরকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করে দারিদ্র্যের অমার্জিত রূপটি তার সম্মুখে যখন অনাবৃত করে তখন রায়বাহুদুরের কাছে মনে

হয়েছে দরিদ্র্যের এই রূপ যেন তাকেই ব্যঙ্গ করছে। অর্থাৎ যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ ও আর্থ-সামাজিক সংকট মতো মধ্যবিত্ত মানুষের এমন রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি করে যে, তখন আর আদর্শবাদী অবস্থান বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না। তখন আদর্শবাদী স্তর অতিক্রম করে তারা বাস্তব পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

'ফেরিওয়ালা' গল্পে তথাকথিত ভদ্রলোক অঘোরের চাকুরি চলে যায়, সংসার অচল হয়ে পড়ে সকলে অঘোরের মুখের দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু অঘোর কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না সংসার চালানোর জন্য। ফলে বাধ্য হয়ে অঘোরকে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে ফেরিওয়ালার পেশা নিতে হয়। তবে অঘোর তখনো 'পচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস' সে পুরোপুরি ফেলে দিতে পারেনি। তাই, বাইরে চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের ছদ্ম-আবরণ বজায় রেখে অঘোরকে গোপনে ওই ফেরিওয়ালার কাজ করতে হয়। এক ধরনের আত্মবঞ্চনা ও ছলনা তখনো রয়েছে, তবু ক্রমশ মধ্যবিত্তের গোত্রান্তর যে ঘটছে এবং তা যে ঘটবেই-এ বিষয়ে নিজের সামাজিক দূরদৃষ্টি সম্পর্কে লেখক যেন নিঃসংশয়' মানিক শুধু মধ্যবিত্ত সমাজের এই অনিবার্য গোত্রান্তরের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস শুধু ব্যক্ত হয়েছে তাই নয়, এই গোত্রান্তর যে তাঁর কাছে একান্ত বাঞ্ছিত তাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেছেন, আত্মবঞ্চনাও কৃত্রিমতার ছদ্ম-আবরণ ছিঁড়ে তথাকথিত ভদ্রলোক সমাজ এর ফলে সহজ সুস্থ অকৃত্রিম জীবনের স্বাদ পাবে-এভাবে অস্তিত্বের এক নতুন অর্থবহ মাত্রা যোজনা করতে পারবে তারা।

'লাজুকলতা' গল্পে আমরা দেখি মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিক চাপে পিষ্ট হয়ে ক্রমেই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এ গল্পে দেখা যায় নারীও দুর্বিষহ অর্থনেতিক প্রয়োজনের চাপে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে জীবনসংগ্রামের কঠিন ভূমিতে নামতে, বাধ্য হয়েছে তথাকথিত মধ্যবিত্ত ভদ্র-পরিবেশ ছেড়ে শ্রমিকদের বস্তিতে উঠে যেতে। এই গোত্রান্তর যার জীবনে ঘটছে, মানিকের দৃষ্টিতে, সেই মধ্যবিত্ত ঘরের লাজুকলতা বধূ তমাললতা কিন্তু সেজন্যে অস্বস্তি বা অসম্মান বোধ করে না–বরং "পাড়ার লোক তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে দ্যাখে বিখ্যাত লাজুক বৌ তমাললতা মাথার কাপড় কোমরে বেঁধে ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিজেই বাসন-কোসন বিছানাপত্র বয়ে নিয়ে বস্তিতে উঠে যাচ্ছে মাথা উঁচু করে।" অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মানুষ কীভাবে অর্থনৈতিক চাপে পিষ্ট হয়ে শ্রমজীবী মানুষের স্তরে নেমে আসছে।

'মহাকর্কটবটিকা' কিংবা 'মরব না সস্তায়'–'ফেরিওয়ালা' সংকলনের এ দুটি গল্পেও দেখি মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের মিথ্যা মর্যাদার জীর্ণপ্রায় আবরণ ছিঁড়ে গৃহবধূকে নামতে হয়েছে পথে, নিতে হয়েছে ফুটপাথের ফেরিওয়ালার পেশা কিংবা স্কুল-শিক্ষিকাকে নিতে হয়েছে বিধবার মিথ্যা ছদ্মবেশে বড়লোকের বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ। মানিক স্থির নিরুচ্ছ্বাস দৃষ্টিতে নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করেছেন দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালের এই অনিবার্য সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃংখলার বিস্রস্ত রূপটিকে বুঝতে চেয়েছেন যে, সমাজের এই বিপর্যয় ও ভাঙনের তলায় তলায় বয়ে চলেছে পুনর্গঠনের, পুনর্বিন্যাসের স্রোত-নতুন কালের নতুন শ্রেণিবিন্যাস। এই অনিবার্য শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে আছে অর্থনৈতিক চাপে পিষ্ট বিধ্বস্ত মধ্যবিত্তের অনেক দুর্গতি ও দুর্ভাবনার নিশ্চিন্ত অবসান। মানিকের সৃষ্ট এমনি এক দারিদ্র্যে ক্ষতবিক্ষত মধ্যবিত্ত ঘরের বধূর কণ্ঠে সেই আশ্বাসবাণীই উচ্চারিত–"আর ভাবি না। কী আছে অত ভয় পাবার, ভাবনা করার? সংসারে কুলি মজুরও তো বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে"।

'ধর্ম (মাটির মাশুল) গল্পেও দেখি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি। মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে লেখা। এ গল্পে সৌমেন ও তমসা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দম্পতি হয়েও সংগ্রামের পটভূমিতে মিলিত হয়। অর্থনেতিক সংকটের নিদারুণ মারের মুখে দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ প্রাণপণে সচেষ্ট হয়েছে আপন অস্তিত্ব রক্ষায়, নিছক টিকে থাকার সংকল্পে সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত তার আপন সুনির্দিষ্ট শ্রেণি-পরিচয় হারিয়ে গেছে। আপন গোত্র পরিচয় হারিয়ে তথাকথিত নিচু তলার শ্রমজীবী সমাজের সঙ্গে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ক্রমশ একাকার হয়ে গেছে।

মধ্যবিত্ত জীবনের কিছু অন্তঃসারশূন্য প্রবণতা, যেমনঃ আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে অসাঞ্জস্যপূর্ণ লোক-দেখানো ভদ্রলোকী মানসিকতা, বাহ্যিক চাকচিক্য, আচার-আচরণে কৃত্রিমতা প্রভৃতির প্রবল বিরোধী ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মার্কসীয় আদর্শে আস্থাস্থাপনের ফলেই মানিক মধ্যস্তরের জীবনের এমন প্রতারক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে সচেতন হয়েছিলেন, তা নয়। নিজ পারিবারিক জীবনকাঠামোই তাঁর মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবনের নানা ফাঁকি ও ক্লেদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিল, ফলে শিল্পী জীবন শুরুর ও অনেক আগে থেকে মানিক মধ্যবিত্ত মানসিকতার সমালোচক ছিলেন। তাঁর নিজ জীবনপ্যাটার্ণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছিল মধ্যবিত্ত জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা। তাঁর শিক্ষিত ও বিত্তবান ভ্রাতাদের আচরণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ও অর্থ-উপার্জনে মানিক অন্য সকল ভাইয়ের পেছনে ছিলেন। এ-কারণে ভাইদের কাছ থেকে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ অবহেলা ও অপমানের শিকার হতে হয় তাকে। বিশেষত মানিকের বিবাহিত জীবনের প্রথম এগার বছর অতিবাহিত হয় পিতৃগৃহে, অন্য ভাইদের সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবেশে। অন্য ভাইদের তুলনায় স্বল্প আয়ের কারণে এই একত্রবাস মানিক দম্পতির জন্য সুখকর হয়নি। ১৯৪৯ সালে পিতৃগৃহ বিক্রির মধ্য দিয়ে যখন সকলে স্বতন্ত্র আবাসে চলে যান, মানিকের তখনকার কিছু ডায়রি লিখন থেকে এর পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে একান্নবর্তী ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর মানিকের পিতা অন্য পুত্রদের নিজস্ব গৃহ

ও সচ্ছল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও মানিকের স্বল্প পরিসরের ভাড়াগৃহে তার অসচ্ছল সংসারেই অবস্থান করেন। ব্যক্তি জীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে অর্জিত এই তিক্ত অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, সমাজচেতনা ও মার্কসীয় ভাবাদর্শে আস্থা প্রভৃতি সহযোগে মানিকের যে-জীবনবোধ নির্মিত-হয় তা ছিল মধ্যবিত্তজীবনের বিকারগ্রস্ততার তীব্র বিরোধী। শ্রমজীবী-জীবনের অকৃত্রিম অকপট সারল্যের প্রতিই মানিকের পক্ষপাত ও আকর্ষণ ছিল বরাবর। চালক (খতিয়ান) ও একান্নবর্তী (খতিয়ান)–এ দুটি গল্পে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে মানিকের এই জীবনভাবনা। তাছাড়া বলা যায়, এ-দুই গল্প মানিকের পারিবারিক অভিজ্ঞতার ফসল। চালক গল্পের বাস-ড্রাইভার অজিত কিংবা একান্নবর্তী গল্পের কেরানি হীরেন-এ-দুই চরিত্রের সঙ্গে লেখক মানিকের বাহ্যিক রূপগত সম্পর্ক আবিষ্কার কঠিন হলেও একান্নবর্তী দুটি পরিবারে অজিত ও হীরেনের অবহেলাপূর্ণ অবস্থানের দিকে দৃষ্টি দিলে মানিকের সঙ্গে তাদের সাযুজ্য সন্ধান আদৌ কঠিন নয়।

রসিক হালদারের চারপুত্রের মধ্যে দুই পুত্র চাকুরে, আরেকটি এমএ-এর ছাত্র, এদের নিয়েই তার পিতৃত্বের চরম সার্থকতা দুশ্চিন্তা তার দ্বিতীয় পুত্রকে নিয়ে। দ্বিতীয় পুত্র অজিত, মানিকের ভাষায়, "হালদার পরিবারের লজ্জা, আফসোস, কলঙ্ক, জন্ম-বয়াটে, ম্যাট্রিক পাশে অক্ষম, বিড়ি ফোঁকা, দেশী খাওয়া কাঠখোট্টা ভূত–এককালীন মোটর ক্লিনার, অধুনা বাস-ড্রাইভার। এমন অশিক্ষিত অজিতের প্রতি সমগ্র পরিবারের বিদ্বেষভাব, অথচ তার আয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে একাংশের মনোভাব পরিবর্তনের কাহিনীই চালক গল্পের তাৎপর্যপূর্ণ দিক। অজিত সম্পর্কে তার পিতা, ভ্রাতা এমন কি স্ত্রীর মনোভাবও অনুকূল ছিল না। পিতার মনে ভয় ছিল, 'অভদ্র ছোটলোক ছেলেটা তিন ছেলের ভদ্র-জীবনে কলঙ্ক আমদানি না করে।' সে যে ভাই, এই কলঙ্গ সয়ে যাওয়াটাই ওদের পক্ষে অসীম উদারতা'–এই ছিল তার বিশ্বাস, অজিতের কাছে তার দাবি, 'ভাই তিনজনের কাছে নিজের অস্তিত্ব যতদূর সম্ভব লোপ করে, চোখ, কান মুখ বুজে মাথা নিচু করে সে এই বাড়িতেই সুখে বাস করুক বৌ আর ছেলেটা নিয়ে'। অন্যদিকে একই গৃহে অন্য ভ্রাতা ও তাদের স্ত্রী-সন্তানের বরাবর অজিতকে অবজ্ঞতা ও অবহেলা করে।

তার সঙ্গে বাক্যালাপ কিংবা একত্রে আহারগ্রহণ সকলের বন্ধ। অথচ সংসারব্যয়ের টাকা অন্য চাকরিজীবী দুই ভাইয়ের চেয়ে সে-ই বেশি দেয়। ভদ্রভাবে জীবনযাপনের জন্য তাদের খরচ বেশি-এই অজুহাতে তারা অজিতের চেয়ে অধিক পরিমাণে উপার্জন করা সত্ত্বেও একান্নবর্তী সংসারে কম খরচ করে। অজিতের প্রতি এ আচরণ সম্পূর্ণ অমানবিক। কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভদ্র-অভিদ্র চাকরিজীবী-শ্রমিক প্রভৃতির ভিন্নতা সম্পর্কে মধ্যবিত্ত শ্রেণিস্তরের মানুষের যে ধারণা, তার পরিপ্রেক্ষিতে এমন আচরণই স্বাভাবিক। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষাই মধ্যবিত্ত মানুষকে এমন অহংকারী জীবনবিচ্ছিন্ন ও উন্নাসিক করে তুলেছে।

অজিত এক সময় মোটরক্লিনার থেকে বাস ড্রাইভার এবং শেষ পর্যন্ত দোতলা বাসের চালক পদে উন্নীত হলে অজিতের আয় শিক্ষিত জ্যেষ্ঠভ্রাতাদেরও অতিক্রম করে যায়। পুত্রের আয়বৃদ্ধির সংবাদে রসিক হালদারের মনও সহানুভূতিতে সিক্ত হয়। অশিক্ষিত এই পুত্রটি পূর্ব থেকেই সংসারে অধিক খরচ দিচ্ছে কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে না। পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রসিক হালদার তাকে স্বতন্ত্রভাবে সংসার-পরিচালনার পরামর্শ দেন। শিক্ষিত-ভদ্রলোক পুত্রদের চেয়ে তার অশিক্ষিত-বখাটে-শ্রমিক পুত্রই অধিক বিশ্বাসভাজন ও নির্ভরযোগ্য-এ-উপলব্ধিতে উপনীত হয়ে রসিক হালদার অজিতের সংসারেই ভিন্নভাবে বসবাসে আগ্রহী হন। অজিত-চরিত্র সম্পর্কে রসিক হালদারের পরিবর্তিত উপলব্ধিটি মানিক অজিতের স্ত্রী লক্ষ্মীর মুখ থেকে ব্যক্ত করেছেন।

‘লক্ষ্মী বলে, ‘বাবা বলেছিলেন যাই হোক তাই হোক আমার এই ছেলেটাই ভাল সংসারে ঠিকমতো টাকা দেয়, নিজের আর বৌয়ের বাবুগিরিতে সব উড়িয়ে দেয় না..... বাবা আমায় বললেন, ছেলেদের মধ্যে তুমিই শুধুই বিশ্বাসী। ওসব বাবুদের ওপরে ভরসা নেই। তোমাকে ভিন্ন করিয়ে তোমার সঙ্গে থাকতে চান বাবা। যা করা উচিত এতো তুমি করবে অন্তত, মুখ্যু হও আর যাই হও.....।

রসিক হালদারের এই উপলব্ধির সঙ্গে মানিকের পিতার শেষ জীবনের সিদ্ধান্ত হুবহু মিলে যায়। আসলে তথাকথিত ভদ্রলোকদের চেয়ে শ্রমিকের মন যে অনেক উন্নত উদার ও বিকারহীন। এর মধ্য দিয়ে সেটাই মানিক প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। শিক্ষিত মানুষ নিজের ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিলেও তাদের ভদ্রতাবোধ স্বার্থতাড়িত, অজিতের ভাই সুজিত অজিতের সাথে কথা বলে না অথচ নিজের বেকার জীবনে অজিতের কাছ থেকে ঋণগ্রহণে সংকোচবোধ করে না। ভদ্রলোক-জীবনের এই হলো অন্তঃসারশূন্যতা, ফাঁকি ও কদাকার দিক। তথাকথিত এই ভদ্রশ্রেণির আত্মমর্যাদাবোধেও রয়েছে কৃত্রিমতা ভঙ্গুরতা। যে-কারণে অশিক্ষিত শ্রমিক বলে নিজ ভাইকে পরিচয় দিতেও তাদের মনে সম্মানহানির আশঙ্কা জাগে। এর তুলনায় শ্রমজীবী মানুষের আন্তরিকতা বেশি। এ গল্পের মধ্য দিয়ে মানিক এ-দুই জীবনের চিন্তাধারা ও মূল্যবোধগত ভিন্নতাকে রূপময় করেছেন।

'একান্নবর্তী' গল্পেও মানিকের একই শিল্পাকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল। এ-গল্পেও একই গৃহে চার ভাইয়ের সংসার। এ গল্পেও অন্য ভাইদের দ্বারা অবজ্ঞার শিকার এক ভাই–যার আয় কম এবং যিনি সম্মানজনক কোনো চাকরিতে নিয়োজিত নন। অবশ্য চালক গল্পের মতো ভাইদের মধ্যে তার অবস্থান দ্বিতীয় নয়, তৃতীয়। তাছাড়া এ-গল্পে রসিক হালদারের মতো কোন পিতার পরিবর্তে আছেন একজন বৃদ্ধা মা-যিনি অবহেলিত এই কেরানি-পুত্রের সঙ্গেই থাকেন। দুই গল্পের কাহিনীগত এসব সাযুজ্য মানিকের নিজ পারিবারিক জীবনাভিজ্ঞতার প্রতিফলনকেই স্পষ্ট করে। যদিও এ-গল্পের মুল দ্বন্দ্ব মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকজীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় নি, বরং মধ্যবিত্তজীবনেরই উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের পারস্পরিক অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা এখানে পরিস্ফুটিত হয়েছে, তবু ওরই মধ্য দিয়ে গভীরতার অর্থে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকমানসের দ্বন্দ্বাত্মক রূপটিই আভাসিত হয়।

চার ভ্রাতার মধ্যে তৃতীয় হীরেন কেরানি; অন্য ভ্রাতাদের মধ্যে বীরেন চিকিৎসক, ধীরেন আইনজীবী এবং নীরেন উচ্চমাইনের চাকুরে। স্বল্পবেতনের চাকরি নিয়ে হীরেনের সংসার দারিদ্র্যের যে-মমতাহীন আক্রমণ, তার প্রতি অন্য ভাইরা সহানুভূতিশীল তো নয়ই, বরং এ-নিয়ে তারা বিব্রত ও লজ্জিত। গল্পের শুরুতেই মানিক চারভ্রাতার পারস্পরিক শিথিল সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন :

চার ভাই, বীরেন, ধীরেন, হীরেন ও নীরেন। পরিবারের লজ্জা ও কলঙ্ক সেজ ভাই হীরেন। সে কেরানী, বীরেন ডাক্তার, ধীরেন উকিল, নীরেন দুশো টাকায় শুরু গ্রেডে সরকারী চাকুরী পেয়েছেন আর বছর। হীরেন সাতান্ন টাকার কেরানী, যুদ্ধের দরুন পাঁচ দশ টাকার বোনাস এলাওন্স বুঝি পায়। হীরেনকে ভাই বলে পরিচয় দিতে একটু সরম লাগে ভাইদের। চার ভাই তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তবু।

বাপের তৈরি বাড়িটাতে ভিন্ন ভিন্নভাবে বাজার করে রেঁধে বেড়ে, ঝি চাকর ঠাকুর শুধু নিজেদের ভাল মন্দ সুখ দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তিনটি অনাত্মীয় ভাড়াটের মতো তারা বাস করে।

সহোদর হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক এই অনাত্মীয়তার মূলে রয়েছে উপার্জনের বৈষম্য। আর্থিক সামর্থ্যের ভিন্নতাই পরস্পরকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ধারণে অর্থনৈতিক শক্তির ভূমিকাই যে মুখ্য, এ-গল্পের মধ্য দিয়ে মানিক তা পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। উপার্জনের বৈষম্যের কারণেই এ-গল্পে একান্নবর্তী পরিবারব্যবস্থা ভেঙে যায়। তাছাড় নীরেনকে হীরেনের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে হীনেরকে অধিকতর সংকটের আবর্তে ফেলতেও ধনী ভ্রাতাদের বিবেক দংশিত হয়না। অথচ একই উপার্জন-মানের কয়েকটি নিম্নবিত্ত অনাত্মীয় পরিবার সহজেই একান্নবর্তী পরিবারকাঠামো ধ্বংস করে, বিত্তের সমকক্ষতা তেমনি রক্তসম্পর্কহীন অচেনা মানুষের মধ্যে গড়ে তোলে একান্নবর্তিতার শৃঙ্খল। মানবসম্পর্ক গঠনে রক্তের ধারাবাহিকতার উর্ধ্বে সম্পদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টিকে মানিক নবতর মাত্রায় আলোকিত করেছেন।

এ-গল্প আলোচনায় দেখা যায়, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের মধ্যেও চিকিৎসক ও আইনজীবীর পসার, এমনকি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার উৎকোচজনিত আয়, বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর। অথচ কেরানির জীবনে বেড়েছে দুর্দশা, অসহনীয় দারিদ্র্যের আক্রমণে হীরেনের স্ত্রী লক্ষ্মী আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ হয়। সীমাহীন অর্থকষ্ট লক্ষ্মীর জীবনকে হতাশায় যেরূপ জর্জরিত করে, অন্য তিনটি সমআয়ের সংসারের সঙ্গে একান্নবর্তিতায় তা থেকে মুক্তি ঘটে তার। আসলে আর্থিক দুরবস্থার চেয়েও বিচ্ছিন্নতাজনিত নৈরাশ্যবোধই চরম রূপ ধারণ করেছিল; সমষ্টিগত জীবনযুদ্ধ সেই নৈরাশ্যের যেমন অবসান ঘটায়, তেমনি তা মানসিক শক্তিবৃদ্ধিরও কারণ হয়। প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে জীব সংগ্রামে ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন যাত্রা হতাশায় পর্যবসিত হতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত প্রয়াসই সাফল্যের চাবিকাঠি। অন্য তিন কেরানির সংসারের সংঙ্গে এক এ রান্নার

আয়োজনে যে নতুন আশা হীরেনের দাম্পত্য জীবনে সঞ্চারিত হয় তার মধ্য দিয়ে উপর্যুক্ত বোধই প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রচলিত একান্নবর্তী সংসার কাঠামোর ভাঙ্গন ও নতুন ধরণের একান্নবর্তিতা গড়ে ওঠার কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক মানসিকতার ভিন্নতর রূপকে মানিক এ গল্পে যেমন পরিস্ফুট করছেন, তেমনি বিত্তবান সংসারের হীনমন্যতা সংকীর্ণতা ও ইর্ষাজাত আচরণ উন্মোচনের মাধ্যমে মধ্যবিত্তজীবনের অবক্ষয় ও কলুষতাকেও করেছেন রূপময়। মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা ফাঁকি ও অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে মানিকের আদর্শগত আপত্তি এবং সেই সঙ্গে নিজ পারিবারিক জীবনের বিরূপ অভিজ্ঞতা–উপরে আলোচিত গল্পদ্বয়ে এই উভয়ের সংমিশ্রণ ঘটায় এর তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: মানিকের ব্যক্তিজীবন, এ-দুটি গল্পের মতো, এত স্পষ্টভাবে তাঁর সাহিত্যে আর কোথাও প্রতিফলিত হয়নি। এ-কথা বলার আরও কারণ: নৈর্ব্যক্তিকতা মানিক সাহিত্যের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

তথ্য সূত্র

১। সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ন, এপ্রিল ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, যুগলবন্দী গল্পকার : তারাশঙ্কর মানিক, নভেম্বর, ১৯৯৪, কলকাতা।

৩। সাহেদ মন্তাজ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরালে কথকতা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, ঢাকা।

৪। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্প রীতি, ১৯৮৭, কলকাতা।

৫। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, ১৯৮২, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। ১৯০৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরে। তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে ৩৯টি উপন্যাস, ১টি নাটক এবং ১৬টি গল্পগ্রন্থ রয়েছে। তিনি প্রথম জীবনে ফ্রয়েডকে অবলম্বন করে সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালে কমিউস্টি পার্টিতে যোগ দিলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি গল্প উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। সেক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য অতুলনীয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর লেখায় কিভাবে এসেছে তা পর্যবেক্ষণ করা। তিনি মধ্যবিত্তকে নিয়ে গল্প রচনা করেছেন কিন্তু সেগুলোর সংখ্যার তুলনায় নিম্নবিত্তের নিয়ে লেখা গল্পই বেশি।

মানিকের ছোটগল্পে একদিকে মধ্যবিত্ত চরিত্রের অসংগতি, ভন্ডামি, অসারতা ও অন্তঃসারশুন্যতা অন্যদিকে তাঁর অর্ন্তভেদী দৃষ্টি পৌঁছেছে 'বিকাশের মোহে মূর্চ্ছাহত' মধ্যবিত্ত নরনারীর মনের অস্বাভাবিক রুগ্ন জটিলতায়-যার পিছনে আছে অন্ধ যৌন অবচেতনার এক কুটিল অন্ধকার জগৎ। 'বিবেক' আততায়ী গল্পে দেখা যায় মধ্যবিত্তের অসংগতি, ভন্ডামি আবার শৈলজশিলা, সিঁড়ি গল্পে অন্ধ যৌন অবচেতনার রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

বর্ষাকালের কোন কোন সময় সমগ্র আকাশ হঠাৎ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মনে হয় অন্ধকারই বুঝি স্থায়ী হয়ে গেল। সেসময় বিদ্যুৎ চমক জানিয়ে দেয় অন্ধকারের পেছনেও আলোও আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র মধ্যবিত্তকে দুমড়ে মুচড়ে দিলেও কোন কোন মধ্যবিত্ত চরিত্র জানিয়ে দেয় গভীর নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়।

'নমুনা' গল্পে মধ্যবিত্ত কেশবের অনিবার্য ধ্বংসের মধ্যেও এক ধরনের পরোক্ষ প্রতিবাদী মনোভাব টিকে থাকে 'ছাটাই রহস্য' গল্পে প্রতিমা ধস ও ধ্বংসের স্রোতে নিমজ্জিত হয়েও এক সদর্থক চেতনায় উন্নীত হয়। 'ফেরিওয়ালা' গল্পে সমগ্র বিপর্যয়ের মধ্যেও পঁচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস বজায় থাকে।

এভাবে মধ্যবিত্তের নানা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পে। মধ্যবিত্তকে নিয়ে অনেকে ছোটগল্প রচনা করেছেন কিন্তু সামগ্রিভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে যেভাবে ধরা পড়েছে তা আর অন্য কোন লেখকের রচনায় দেখা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গ্রন্থ

ক. গল্পগ্রন্থ

১। অতসীমামী, কলকাতা, ৭ই আগষ্ট ১৯৩৫

২। প্রাগৈতিহাসিক, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল, ১৯৩৭

৩। মিহি ও মোটা কাহিনী, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

৪। সরীসৃপ, কলকাতা, আগষ্ট ১৯৩৯

৫। বৌ, কলকাতা, ১৯৪৬

৬। সমুদ্রের স্বাদ, কলকাতা, ১৯৪৬

৭। ভেজাল, কলকাতা, ১৯৪৪

৮। হলুদ পোড়া, কলকাতা, মে-জুন ১৯৪৫

৯। আজকাল পরশুর গল্প, কলকাতা, মে-জুন ১৯৪৬

১০। পরিস্থিতি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৬

১১। খতিয়ান, কলকাতা, ১৯৪৭

১২। ছোট বড়, কলকাতা, আগষ্ট ১৯৪৮

১৩। মাটির মাশুল, মুর্শিদাবাদ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৪৮

১৪। ছোট বকুলপুরের যাত্রী, কলকাতা, জুন-জুলাই ১৯৪৯

১৫। ফেরিওয়ালা, কলকাতা, এপ্রিল-মে, ১৯৫৩

১৬। লাজুকলতা, কলকাতা, ২২ অক্টোবর, ১৯৫৩

খ. উপন্যাসসমূহ

প্রথম উপনাস 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), জননী (১৯৩৫), পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), জীবনের জটিলতা (১৯৩৬), অমৃতস্য–পুত্রাঃ (১৯৩৮), অহিংসা (১৯৪১), সহরতলী (১৯৪১), সহরতলী দ্বিতীয়পর্ব (১৯৪১), ধরাবাঁধা জীবন (১৯৪১), আদায়র ইতিহাস (১৯৪৪১), চতুষ্কোণ (১৯৪২), সহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), প্রতিবিম্ব (১৯৪৩), দর্পণ (১৯৪৫), চিন্তামনি (১৯৪৬), চিহ্ন (১৯৪৭), জীয়ন্ত (১৯৫০), পেশা (১৯৫১), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), সোনার চেয়ে দামী ১ম খণ্ডঃ বেকার (১৯৫১), ছন্দপতন (১৯৫১), সোনার চেয়ে দামী (২য় খণ্ডঃ আপোষ, ১৯৫২), ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২), পাশাপাশি (১৯৫২), সার্বজনীন নামে ২টি উপন্যাস (১৯৫২), নাগপাশ (১৯৫৩), আরোগ্য (১৯৫৩), চালচলন (১৯৫৩), তেইশ বছর আগে (১৯৫৩), শুভাশুভ (১৯৫৪), হরফ (১৯৫৪), পরাধীন প্রেম (১৯৫৫), হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬), মাশুল (১৯৫৬)

গ. নাটক

ঘ. প্রবন্ধ

ঙ. কাব্য গ্রন্থ

চ. ছোটদের সংকলন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত সমালোচনাগ্রন্থ

ছ.

১। বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, ১৩৫৫/১৯৪৯, কলকাতা।

২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, ১৩৬৫/১৯৫৯, কলকাতা।

৩। রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'ছোট গল্পের কথা' সেপ্টেম্বর ১৯৫৯, কলকাতা।

৪। বিনয় ঘোষ, সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৩৬৮/১৯৬২, ঢাকা।

৫। শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার, ১৯৬২, কলকাতা।

৬। সরোজমোহন মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, এপ্রিল ১৯৭০, কলকাতা।

৭। ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, ঢাকা।

৮। প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, ১৩৮২/১৯৭৬, কলকাতা।

৯। নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত মানিক সাহিত্য সমীক্ষা, জুন ১৯৮১, কলকাতা।

১০। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, ১৯৮২, কলকাতা।

১১। Tom Bottomore Edited by 'A Dictionary of Marxist Thought' Uk, 1983

১২। মুহম্মদ ইদরিস আলী, বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ১৯৮৫, ঢাকা।

১৩। নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-জিজ্ঞাসা, মে ১৯৮৬, কলকাতা।

১৪। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি, ১৯৮৭।

১৫। আবুল কাশেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্যশেণি ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৮৮, ঢাকা।

১৬। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, ১৯৮৯, কলকাতা।

১৭। শিখা ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ঃ অবয়বগত বিশ্লেষণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, কলকাতা।

১৮। দিলীপন ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃফ্রয়েড থেকে মার্কস, জুলাই-আগস্ট ১৯৯০, কলকাতা।

১৯। কায়েস আহমেদ সম্পাদিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৪, ঢাকা।

২০। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত যুগলবন্দী গল্পকার ঃ তারাশঙ্কর মানিক, নভেম্বর ১৯৯৪, কলকাতা।

২১। আজহার ইসলাম, বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য, এপ্রিল ১৯৯৬, ঢাকা।

২২। খালেদা হানুম, বাংলাদেশের ছোট গল্প, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, চট্টগ্রাম।

২৩। সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ, এপ্রিল ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৪। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠগল্প, ঢাকা, ১৯৯৮।

২৫। তপোধীর ভট্টাচার্য, ছোটগল্পের অন্তর্ভূবন, ২০০০, কলকাতা।

২৬। বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, মে ২০০২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৭। মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মধ্যবিত্তের জীবন সংকট, অপ্রকাশিত গ্রন্থ ২০০৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৮। যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দ্বন্দ্বের দুই মুখ, জানুয়ারি ২০০৮, কলকাতা।

২৯। সাহেদ মন্তাজ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরালে কথকতা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, ঢাকা।